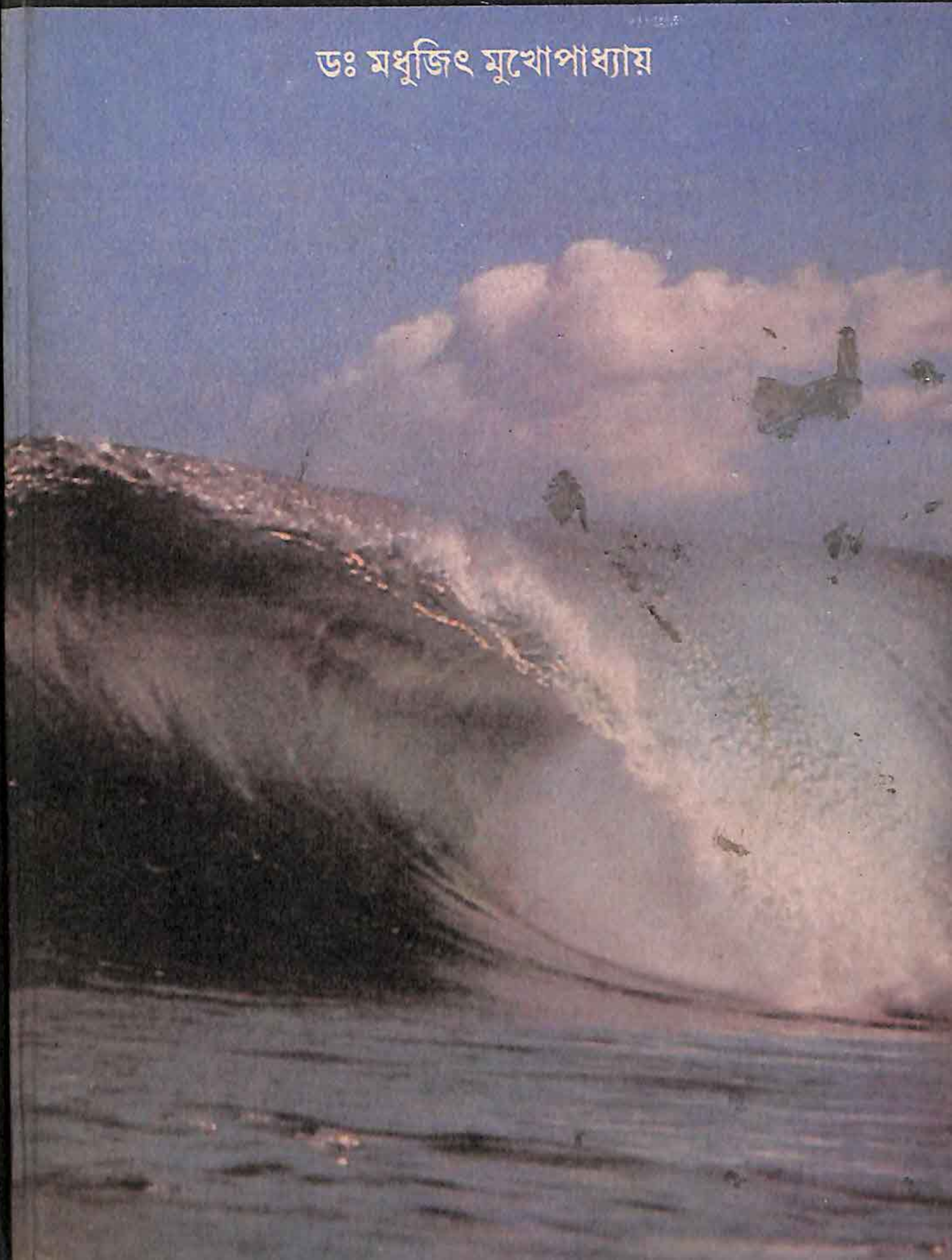
সমুদ্র ঃ শংকা ও আশংকা

ডঃ মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়



সমুদ্র ঃ শংকা ও আশংকা

ডঃ মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়

বেস্টবুকস্
১ এ কলেজ রো, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

Samudra : Shanka Ashanka
By Dr. Madhujit Mukhopadhyay.

প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া ১৩৯৮,
অক্টোবর ১৯৯১,

ISBN : 81-85252-39-4

প্রকাশক ঃ
প্রকাশন বিভাগ
বেস্টবুক্‌স্
১ এ কলেজ রো কলিকাতা-৭০০ ০০৯

টাইপ কম্পোজিশন
টাইপোস ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
৬২/১, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-৭০০ ০২৯

মুদ্রাকর
মিত্র প্রেস
৮১, বি পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা

স্বর্গত বিজন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
স্বর্গতা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের
পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

সমুদ্রের অগাধ রহস্য নিয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। সেই দিগন্তবিস্তৃত অনন্ত জলরাশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অজানা ও অচেনা জগৎ — তা মানুষের দৃষ্টি বারবার আকর্ষণ করেছে। সে বরাবরই উৎসাহী হয়ে উঠেছে সাগরজলের গভীরে নব নব তথ্যে উদ্ভাসিত হতে। বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে তাকে কখনো সাগরের বুকে ভেসে বেড়াতে হয়েছে, কখনো বা তাকে ডুব দিতে হয়েছে সাগরের গহন জলের অতলে। এ কাজ সম্পাদনে তার নিরাপত্তা পদে পদে বিঘ্নিত হয়েছে! যে প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে সে সাগরকে মোকাবিলা করতে উদ্যত হয়েছে, তা তাকে মাঝে মাঝে অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে গেছে। এই অকরুণ পরিবেশে সমুদ্র নিয়ে মানুষের যে শংকা ও আশংকা জেগে উঠেছে, তা এই বইয়ের বিভিন্ন রচনায় পরিবেশিত।

রচনাগুলির মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি মূলত প্রযুক্তিবিজ্ঞান ভিত্তিক। তবে পপুলার সায়েন্সের ধাঁচে লেখার চেষ্টা করেছি।

এ বইয়ের রেখাচিত্রগুলি এঁকেছেন শ্রীতিলক সরকার, শ্রী আনন্দশংকর মিত্র ও শ্রী চিন্ময় মুখার্জি। বইয়ের বিভিন্ন আলোকচিত্রগুলি শ্রী অভিজিৎ মুখার্জির দাক্ষিণ্যে। এদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

খ্যাতনামা বিজ্ঞান লেখক শ্রী অমরনাথ রায় পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বেশ কিছুকাল আগে বইটি লেখা শেষ হয়েছিল। কিছুটা নিজের অনীহার জন্য প্রকাশে বিলম্ব হল।

মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়

নেভাল আরকিটেকচার ডিপার্টমেন্ট
আই. আই. টি, খড়গপুর

সূচিপত্র

১

সমুদ্রে সংকট

বিচিত্র রূপ নিয়ে সাগর তরঙ্গায়িত। কখনো সে মৌনতাপস, কখনো বা তার অঙ্গে লেপে আছে দুর্বাসার অভিশাপ। সৃষ্টির সেই আদিলগ্ন থেকে সাগরের এই বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে ক্রমাগতই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মানুষ। সাগরজলের এই সুবিশাল বিস্তৃতিকে কাজে লাগানোর অন্যতম প্রয়াস – তার বুকে ভেসে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাত্রার মধ্য দিয়ে। কখনো বা এর মধ্যে সে পাচ্ছে ভ্রমণের আনন্দ, কখনো বা তার উদ্দেশ্য একদেশ থেকে অন্যদেশে পণ্য সরবরাহ করা। সাগরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মোকাবিলা করার সেই চিরায়ত সংগ্রাম তার আজও চলছে।

ফেনোচ্ছল সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির মধ্যে যে অগাধ রহস্য আছে, তা বুঝে ফেলতে মানুষের বেশি সময় লাগেনি। সাগরের জল ও তল যে অসীম সম্পদের অধিকারী তা সে অচিরেই জেনে গিয়েছিল। তাই কালবিলম্ব না করে সে সম্পদ আহরণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। বিজ্ঞান তার পাশে এসে দাঁড়াল নব নব আবিষ্কারের চাবিকাঠি নিয়ে। প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমান্বয় পরিবর্ধনে সমুদ্রকে মানবকল্যাণের অভিপ্রায়ে ব্যবহার করার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হতে থাকল।

সাগরে প্রথম মানুষ ভেসেছিল ভেলায়। এই ভেলার পরিকল্পনা প্রথম যে করেছিল তার ভাগ্যে কোনো পুরস্কার জুটেছিল কি না জানা নেই। এই আবিষ্কারের আনন্দে সে কতটা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তার কথাও ইতিহাসে লেখা নেই। আর্কিমিডিসের সূত্র না জেনেও সেদিনের সেই আবিষ্কারের সুদূরপ্রয়াসী প্রভাব সম্বন্ধে সে নিশ্চয় অবহিত ছিল না। তারপর দীর্ঘকাল ধরে তার ধারণাকে আরও পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করা হয়েছে। এই ব্যাপক উন্নতি সত্ত্বেও যাত্রাপথে বা সাগরের বিভিন্ন কাজে মানুষের গতিবিধি কিন্তু আজও নিরাপদ হয়নি। তাই আদিগন্ত জলোচ্ছ্বাসের রুদ্র প্রকোপে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে আজও দাবী করতে পারে না।

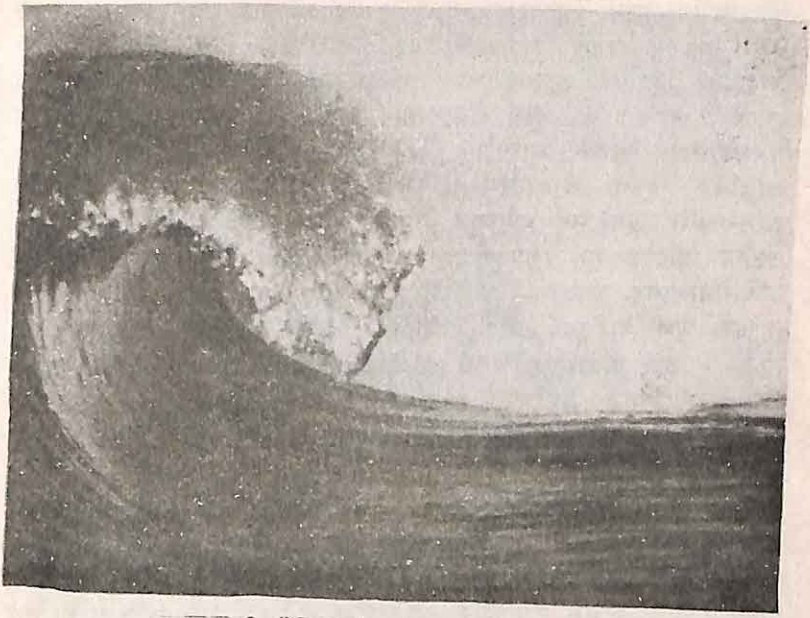
সাগরতটে সদাসর্বদা আছাড় খেয়ে পড়ে ঢেউ। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ

আবহাওয়ায় যখন তাদের আকৃতি অস্বাভাবিকভাবে বিরাট ও ভয়ঙ্কর হতে থাকে, তখন তটবাসীদের সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসে। এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে দক্ষিণ ভারতে ধনুষ্কোটি দ্বীপ সাগরের তলায় চলে গেল। বঙ্গোপসাগরের প্রচন্ড জলস্ফীতির ফলে বাংলাদেশের সন্দীপ দ্বীপের ডুবে যাবার ঘটনা তো মাত্র অল্প কিছু কাল আগের। সেদিন ঐ দ্বীপবাসীদের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে রেখা ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

সাগরের এই ঢেউ সৃষ্টির মূল কারণ বাতাস হলেও, অন্যান্য সূত্র থেকে ঢেউ উৎপন্ন হতে পারে। সাগরের মধ্যে ভূমিকম্প হলে ঢেউয়ের আকৃতি বেড়ে যায়। এভাবে সৃষ্ট তরঙ্গের নাম সুনামিস (tsunamis) (প্লেট নং 1.1)। এই ঢেউগুলো তীরে আঘাত করে সম্পত্তি বিনষ্ট থেকে শুরু করে মানুষের জীবনহানিও ঘটাতে পারে। জাপান সহ প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপ সুনামিসের আঘাতে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সাগরের বুকে ভেসে বেড়িয়েই মানুষ ক্ষান্ত হয়নি, সে তার গভীরে অনবরত ডুব দিয়ে চলেছে। সাগরের যত গভীরে সে প্রবেশ করেছে, ততই তার পরিবেশ অন্ধকারে ঘিরে ধরেছে, জলের শীতলতাও তত বেড়ে গিয়েছে। একদিকে সাগরতলের সম্পদ তাকে আকৃষ্ট করেছে, অন্যদিকে তার জ্ঞানলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য বারবারই তাকে সাগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়েছে। যত গভীরে সে গেছে, ততই আরও বেশি গভীরতায় যাবার বাসনা তার জেগেছে। তাই দেখতে পাই গত কয়েক শ' বছর ধরে ডুবুরির সাজের বিবর্তন। তবু সাগরের জলের ভেতর চলাফেরা করার বিপদ তাদের আজও কমেনি। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে জলের ভেতর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য আজ অনেক বেশি হলেও, সমুদ্রের বিপজ্জনক প্রাণীর মুখোমুখি এখনও তাদের হতে হয়। অনেক প্রাণী আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকারক নয় বলে বিবেচিত হলেও, মানুষের শরীরে তাদের স্পর্শ অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতি ঘটাতে পারে। তাই জলের তলার এইসব প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে ডুবুরির সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। জলের মধ্যে যে কোনো রকম অসতর্ক আচরণ প্রাণসংশয়ের মত বিপদও ডেকে আনতে পারে।

জলযানে ভেসে থেকেও কি মানুষের স্বস্তি মিলেছে! জাহাজে অবস্থানকালে মাঝসমুদ্রে আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ হয়ে যেতে পারে। চারিদিকে অথৈ জলের মধ্যে হাওয়ার শন্ শন্ আওয়াজে তার বুকের ধুকধুকানি শুধু বেড়েই যায়। হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের তালে তালে জাহাজ যখন ক্রমাগত দুলতে থাকে, তখন নাবিক আপ্রাণ চেষ্টা করে জাহাজকে ভাসিয়ে রাখতে। তবু কখনো কখনো ব্যর্থ হয় সে। জাহাজের সঙ্গে কখনও সে তলিয়ে গেছে সাগরের



প্লেট নং 1.1 ঃ সাগরে ভূমিকম্প থেকে উদ্ভূত তরঙ্গ – সুনামিস

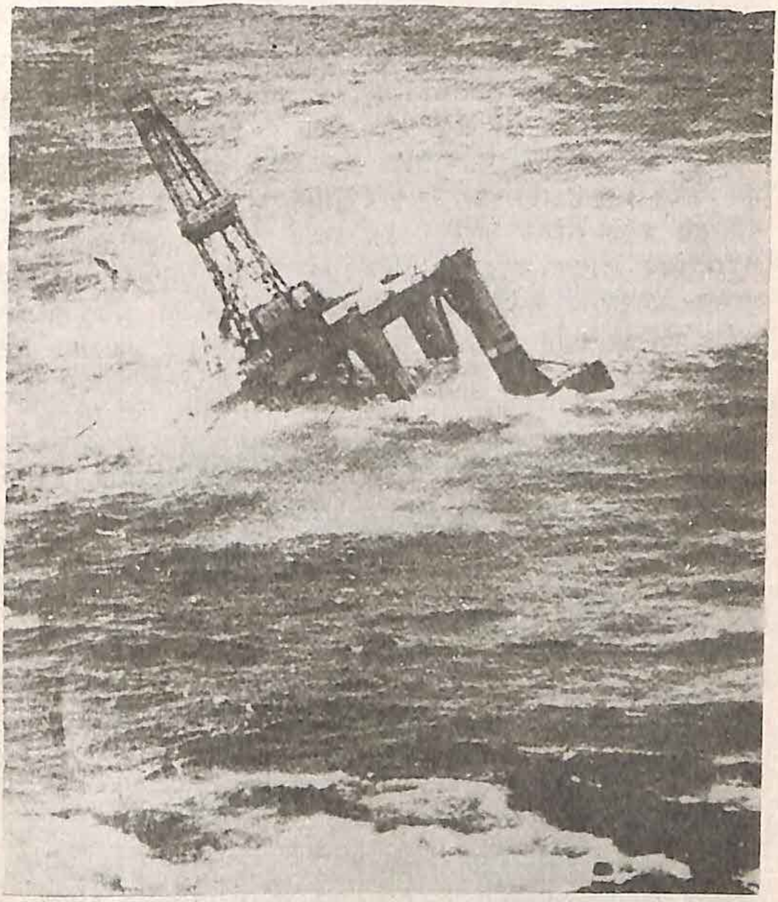
গভীরে, কখনো বা জাহাজ ডুবে গেলেও সে কোন না কোন উপায়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করেছে অদূর ভবিষ্যতে কেউ তাকে উদ্ধার করতে আসবে এই আশা বুকে নিয়ে । তাকে চিন্তা করতে হয়েছে জাহাজডুবির পূর্বমুহূর্তে কি করে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচানো যায় । উড়োজাহাজের যাত্রীদের থেকে সমুদ্রযাত্রীর আত্মরক্ষার প্রস্তুতিপর্বের সময় কিছু বেশি থাকে । তাই সে জাহাজে লাইফ জ্যাকেট, লাইফরাষ্ট ও লাইফবোট মজুত রাখে । সাগরের জল শশকের মত শান্ত থাকতেও জাহাজডুবির ঘটনা ঘটেছে, যেমনটা হয়েছিল টাইটানিকের বেলায় ।

সমুদ্রের স্বাভাবিক পরিবেশে অনেক সময়ই ছোট ছোট জলযান নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না । জেলেরা নৌকা করে তীর থেকে বেশ কিছু দূরে যায় । আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নবতম প্রযুক্তি প্রয়োগে নির্মিত মৎস্যশিকারের তরী (fishing trawler) যায় তীর থেকে বহু দূরে । জেলের নৌকা বা ফিসিং ট্রলারের নিমজ্জিত হবার ঘটনা কিন্তু অহরহই শোনা যায় ।

সাগরের মধ্যে জাহাজে আগুন লাগার ঘটনাও প্রচুর আছে। এক স্থানে আগুন লেগে ক্রমে তা সমগ্র জাহাজকে গ্রাস করে। আগুন নেবানো গেলেও অনেক সময় জাহাজের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় মেরামত করেও তা পূরণ করা সম্ভব হয় না। কয়েক শতাব্দী আগে শত্রুজাহাজে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হত। আধুনিক যুগে জাহাজে অগ্নিসংযোগ শত্রুপক্ষের ক্ষতিসাধনের অনেকগুলি উপায়ের অন্যতম। আর আজকাল আগুন লাগানোর পন্থাটা আগের যুগ থেকে অনেক পাল্টে গেছে। আধুনিক জাহাজে অগ্নিনির্বাপণের সবরকম ব্যবস্থাই মজুত থাকে। তবু একবার আগুন লাগলে মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে যায় না, এমন নাবিকের আজও জন্ম হয়নি। তাই অনন্ত জলরাশি পরিবেষ্টিত হয়ে এই সংকটের মুহূর্তে তার ভুলের মাত্রা ক্রমাগতই বেড়ে যেতে থাকে।

গত কয়েক দশক ধরে সাগরতলে তেলের সন্ধান মিলেছে। সেই তেল আহরণের জন্য সমুদ্রে প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়। অনেক সময় প্রবল চাপে বেরিয়ে আসা তেল ও গ্যাস মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এদের ক্রমাগত ঘর্ষণে কখনো বা অবয়বে কিংবা পাটাতনে আগুন লেগে যায়। এই ব্লো-আউটের ফলে শুধু যে প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হয় তাই নয়, তেল সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে যাবার ফলে সমুদ্র স্থানীয়ভাবে দূষিত হয়। ব্লো-আউট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন এবং তা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্যও।

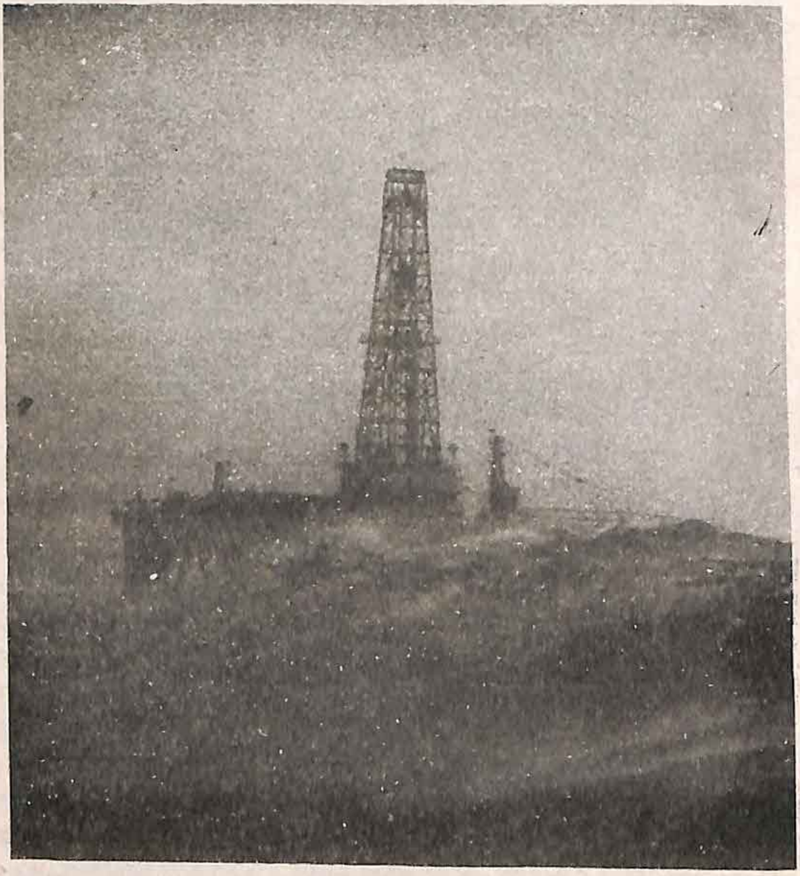
সব সময়ই পৃথিবীর কিছু লোক সাগর পারাপার করছে। শারীরিক অসুস্থতা তিথি-নক্ষত্র দেখে আসে না। তাই সমুদ্রে অবস্থানকালে যে কোন যাত্রীই পীড়িত হয়ে পড়তে পারে। সমুদ্রপথে একমাত্র যে 'অসুখ' সুখ আনে তা হলো সন্তানের জন্মদান। এছাড়া যে কোন ব্যাধিই চিন্তার উদ্রেক করে। যখন চিকিৎসকের উপস্থিতি জাহাজে একান্ত প্রয়োজন তখন সেখানে সে নাও থাকতে পারে। কিংবা সাধারণ ডাক্তার লভ্য হলেও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন শল্য চিকিৎসাটাই জরুরী। মাঝদরিয়ায় যাত্রীর হার্ট এ্যাটাকের সম্ভাবনা যেমন বাতিল করা যায় না, তেমন আপেন্ডিসাইটিসের প্রচন্ড ব্যথা সম্ভাব্য রোগের তালিকা ভুক্ত হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ ঠিক সময়ে পেলে রোগের গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়। তবে দোদুল্যমান জাহাজে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের কথা বোধ হয় চিন্তা করা যায় না। হঠাৎ অসুস্থতা ছাড়া আর একরকমের অস্বাচ্ছন্দ্য প্রায় প্রত্যেক যাত্রীর শরীরে দানা বাঁধে। শারীরিক বৈকল্যের সূত্র জাহাজের বিভিন্ন রকমের অবিরাম দোলন বা ঘূর্ণন। এই ধরনের অস্বস্তি সাধারণতঃ যাত্রার প্রথম দিকেই দেখা যায়, কিংবা জাহাজের দোলন বা ঘূর্ণনের পরিমাণ বেশি হলেই এই অসুস্থতা অন্যসময়ও দেখা দিতে পারে।



প্লেট নং 1.2ঃ হেলে যাওয়া অর্ধভাসমান জাহাজ

সাগরের মধ্যে মানুষও মানুষের বিপদ ডেকে আনতে পারে। যুদ্ধের সময় মানুষ তো আর মানুষ থাকে না, তাই সে প্রসঙ্গ এখানে আনছি না। বেশ কয়েক শ' বছর ধরে জলদস্যুতা ঘটে চলেছে। ইদানীং তার আনুপাতিক হার কম হলেও এটা কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। প্রতি বছরই বেশ কিছু জাহাজের হদিশ মেলে না। এদের কিছু কিছু যে জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সাগরের জলে তলিয়ে গেছে এরকম অনুমান করা ভুল নয়। অধুনা আর এক উপদ্রব সবে সুরু হয়েছে, তা হল জাহাজছিনতাই। এতদিন বিমানছিনতাই-এর বিভিন্ন ঘটনার কথাই আমরা শুনে এসেছি। আকাশপথের সেই দুরভিসন্ধি এবার সাগরের বুকেও নেমে এসেছে।

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু কিছু কাজ মানুষের নিজেরই স্বার্থের পরিপন্থী হচ্ছে। সমুদ্র জলের প্রাচুর্যতার জন্য তার তীরে আজ গড়ে উঠেছে অসংখ্য কলকারখানা। সেখান থেকে নিঃসৃত সব আর্বজনা তীরের জলেই নিষ্কাশিত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কারণে সাগরের জলে জাহাজ থেকে প্রচুর তেল পড়ে। সমুদ্রের দূষণের এরা মূল উৎস। স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে এই দূষিত জল মানুষের শরীরের ক্ষতি করতে পারে। এর থেকে সামুদ্রিক প্রাণীর শরীরেও প্রচুর বিষ প্রবেশ করে। প্রাণিজগতে বিভিন্ন প্রাণীর পাশাপাশি সুসঙ্গত অবস্থানের জন্য একশ্রেণীর প্রাণীর বিপদ বা অবলুপ্তি অন্য প্রাণীর জীবনে প্রচুর প্রভাব এনে ফেলে। মানুষকেও এর জন্য মূল্য ধরে দিতে হচ্ছে। তাই বায়ুমন্ডল দূষণের মত সামুদ্রিক দূষণও তাকে



প্লেট নং 1.3ঃ বিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝে তেল উৎপাদক প্লাটফর্ম

বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করে তুলেছে।

স্থলের সম্পদ দিন দিন যত নিঃশেষিত হচ্ছে, ততই মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের অপরিমিত সম্পদ সম্বন্ধে সে বহুযুগ ধরেই অবহিত। কিন্তু তা উদ্ধার করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। তারজন্য চাই উন্নত প্রযুক্তি আর প্রয়োগ। তাকে আয়ত্ত করবার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। তাই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পেরেছে পশ্চিম দুনিয়ার মাত্র অল্প কয়েকটি ধনী রাষ্ট্র। কিন্তু সমুদ্র তো শুধু ওই কটি রাষ্ট্রেরই সম্পত্তি নয়। সমগ্র মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে তাকে পেয়েছে। তাই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোর কাছে এ এক নতুন আপদ এসে হাজির হয়েছে। যে জিনিসে তাদেরও অধিকার আছে, তা তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে প্রায় লুট হতে চলেছে। তবে অধিকার সম্পর্কে সে সচেতন, তাই আজ চারিদিকে সরব ধ্বনি উঠেছে সমুদ্রের অধিকার নিয়ে।

নতুন মহাদেশ আন্টার্কটিকায় সম্পদ অনুসন্ধানের কিছু কিছু কাজ চলছে। সারা পৃথিবীর পরিবেশ অনেকাংশে আন্টার্কটিকার উপর নির্ভর করে। সেখানে যদি সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা চালানো হয় তবে সেখানকার পরিবেশ দূষিত হবার আশংকা রয়েছে, যার প্রভাব সারাবিশ্বে প্রতিফলিত হতে পারে। তাই সেখানে সম্পদ লভ্য হলেও তা অদূর ভবিষ্যতে ভোগ করার কোন সম্ভাবনা নেই।

তবে হাজারো বিপদ ও অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও সাগরের সঙ্গে মোকাবিলা করতে মানুষ কখনই পিছুপা হয়নি। এগিয়ে যেতে যেতে হয়ত কখনো সে থমকে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা সব কঠিন বাধা অতিক্রমের পরিকল্পনা করার জন্য। এগিয়ে যাবার এই ইচ্ছে তাকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করছে। এই চ্যালেঞ্জই তো তাকে নিয়ে চলেছে সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতার দিকে।

২

সমুদ্রে যেসব প্রাণী বিপদ ডেকে আনে

সমুদ্রের অসীম জলরাশির মধ্যে বিভিন্ন গভীরতায় যে অসংখ্য প্রাণী ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কোনরকম ক্ষতি করার ক্ষমতা তাদের নেই। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ যেসব প্রাণী সেখানে বিরাজমান, তাদেরও বেশির ভাগই নিরীহ। তবে অল্প সংখ্যক এমন কিছু প্রাণীও রয়েছে যারা মানুষের বিপদ ডেকে আনতে পারে। এদের হাতে মানুষের গুরুতরভাবে জখম হওয়া থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারে।

ডাঙার মানুষের সঙ্গে সামুদ্রিক প্রাণীর সাক্ষাৎ নিত্যকার নয়। তবে কেউ কেউ কখনো সখনো এদের মুখোমুখি হয়ে যায়। সাগরজলে সাঁতার কাটতে গিয়ে এদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হবার ঘটনা প্রচুর আছে। জাহাজডুবি বা জাহাজে আগুন লাগার সময় কিছু কিছু লোক সমুদ্রে পড়ে যায়। নৌকা উল্টে গিয়ে অনেক জেলে জলে হাবুডুবু খায়। জীবনের এই সঙ্কটমুহূর্তে চারিদিকে বিপজ্জনক প্রাণী পরিবেষ্টিত হলে বিপদ আরও তীব্র হয়। এই প্রাণীদের সঙ্গে নিত্য কারবারী হল ডুবুরির দল। বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ডুবুরিরা সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করে। এর জন্য তাদের শরীরে থাকে এক বিশেষ ধরনের বর্ম। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় এইসব প্রাণীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ডুবুরিদের পোশাক ভেদ করে শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

সামুদ্রিক প্রাণীর হাতে মানুষ বিপদগ্রস্ত হতে পারে সাধারণতঃ তিন ভাবে ঃ ১) প্রাণীদের দংশন বা তীক্ষ্ম মেরুদন্ড অথবা রুক্ষ আবরণ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হওয়া, ২) হুলজাতীয় জিনিসের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে বা ওইসব প্রাণীদের দ্বারা গাত্রঘর্ষণে ত্বকের বিভিন্ন রোগ হওয়া এবং ৩) তড়িতাহত হওয়া। কিভাবে আঘাত আসবে তা নির্ভর করে প্রাণীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর।

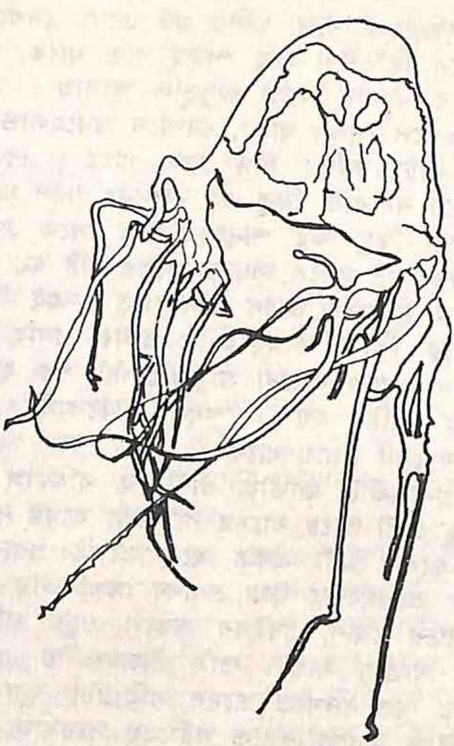
স্পন্‌জ্ সমুদ্রের বহুকোষবিশিষ্ট জীব। এরা সেতুর স্তম্ভে, ডুবন্ত পাহাড়ে, অন্য প্রাণীর শক্ত বহিরাবরণে বা সমুদ্রতলে নিশ্চুপ অবস্থায় থাকে। নড়তে চড়তে এদের যেন বড্ড অনীহা। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে এদের দেখতে পাওয়া যায়—সমতল, গোলাকার, শাখাবিশিষ্ট বা অন্য কিছু। এদের রঙের বাহারও খুব – খয়েরী, ছাইরঙা, সবুজ, হলদে, লাল, কমলা – প্রায় সবরকমের রঙই এদের

হতে পারে। বহুছিদ্রযুক্ত খালি থলির মত এদের দেখতে। বালির ওপর নিশ্চেষ্টভাবে স্থিতিশীল হয়ে স্পন্জ্ পড়ে থাকে, তাদের স্পর্শ করলে ফণীমনসার কাঁটার মতো অনুভূতি জাগায়। তাই সমুদ্রের ভেতর যে সব অঞ্চলে স্পন্জ্ থাকে, সেখানে অবহেলাভরে হাঁটাচলা করলে, তাদের কাঁটা শরীরে বিদ্ধ হতে পারে। এতে সে রকম মারাত্মক কিছু ঘটে না বটে, কিন্তু এই দংশনের ফলে যথেষ্ট বেদনার সৃষ্টি হয়। এছাড়া কিছু কিছু স্পন্জের দেহ থেকে একপ্রকার বিষ নির্গত হয়, যা ত্বক স্পর্শ করলে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে অগ্নিস্পন্জের নাম সবচেয়ে আগে এসে পড়ে। এই বিষস্পর্শে ত্বক ফুলে যেতে পারে কিংবা চামড়ায় একপ্রকার প্রদাহ দেখা দিতে পারে। এর ফলে কখনো কখনো আঙুলের গাঁট শক্ত হয়ে যায় এবং প্রচন্ড কন্ডুয়নের সৃষ্টি হয়। স্পন্জ্ এককোষী জীব হলেও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সমুদ্রের তলায় থাকে।

সাধারণতঃ প্রবালকীট জাতীয় প্রাণীদের বহিরাঙ্গ নরম, তবে এদের কিছু কিছু শ্রেণী আছে যাদের বাইরেটা যথেষ্ট কঠিন আবরণে ঢাকা। অনেকগুলো প্রাণী একত্র হলে তবেই প্রবালপ্রাচীর গড়ে ওঠে। সাগরের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এলাকা যেখানকার তাপমাত্রা 20 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশি, সেইসব অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে প্রবাল প্রাচীর দেখতে পাওয়া যায়। তাই গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় এদের প্রাচুর্য। কাপের মত দেখতে এদের বাইরেটা ক্ষুদ্র কর্ষিকাযুক্ত। জলের তলায় কাজ করতে করতে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ডুবুরিরা অনেক সময় প্রবালকে স্পর্শ করে ফেলে। জলের গভীরে ছুরির মত ধারালো কর্ষিকার স্পর্শে সঙ্গে সঙ্গেই বেদনা উদ্ভূত হয় না বটে, কিন্তু জল থেকে বেরোবার সাথেসাথেই ব্যথার সূত্রপাত হয়। প্রবালপ্রাচীরে কারুর ত্বক যদি কখনো ঘষে যায়, তবে সেই অভিজ্ঞতা তার কাছে চিরজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাগর ভীমরুল (চিত্র নং 2.1) স্থল ভীমরুলের চেয়ে অনেক বিষাক্ত। মানুষকে মেরে ফেলতে এদের সময় লাগে এক মিনিটেরও কম। সাধারণতঃ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় এরা ঘুরে বেড়ায়। জলের রঙের সঙ্গে মিশে যায় বলে এদের সাগরে চিনে ওঠা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। এই অসুবিধা না থাকলে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের চিহ্নিত করা সহজই হত। সাগর ভীমরুলের সঙ্গে বহুলাংশে মিল পর্তুগীজ ম্যান–অব্–ওয়ারের (চিত্র নং 2.2)। এদের শরীরে প্রচুর হুল থাকে, তবে তা খুব সুক্ষ্ম নয়। তবুও এদের দংশন যথেষ্ট বেদনাদায়ক। তাছাড়া অনেক রকমের জেলিফিস্ আছে যাদের সঙ্গে ঘর্ষণে শরীরে ফুসকুড়ি বেরিয়ে যায়।

সমুদ্রশল্লকীর স্পর্শ যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা চিত্র নং 2.3



চিত্র নং 2.1 ঃ সাগর ভীমরুল

থেকে অনুমান করা যায়। এদের আবের মত শরীর থেকে সারি সারি কাঁটা বেরিয়ে থাকে। ডুবুরিদের সঙ্গেই সাধারণতঃ এদের মোলাকাত হয়। অনেক সময় ঢেউয়ের তোড়ে কোন কোন ডুবুরি সমুদ্রশল্লকীর বসতিতে আছাড় খেয়েছে। আর কি নিদারুণই না সে অভিজ্ঞতা! বর্ম ভেদ করে এদের কাঁটা শরীরে প্রবেশ করে এবং তা খুবই দ্রুতভাবে। আর এই কাঁটা একবার শরীরে ঢুকলে শল্যচিকিৎসা ছাড়া তা বের করা সম্ভব নয়।

কিছু কিছু বড় তারা মাছ আছে যারা 70 সেন্টিমিটার অবধি লম্বা হয়। 13 থেকে 16 টা প্রশাখা এদের বেরিয়ে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রান্তিবৃত্ত অঞ্চলে এদের বাস। এরা দেখতে খয়েরী বা টকটকে লাল। শরীরের বাইরেটা বিষে পরিপূর্ণ 5 সেন্টিমিটার লম্বা কাঁটায় ভর্তি। এদের স্পর্শে মানুষের শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

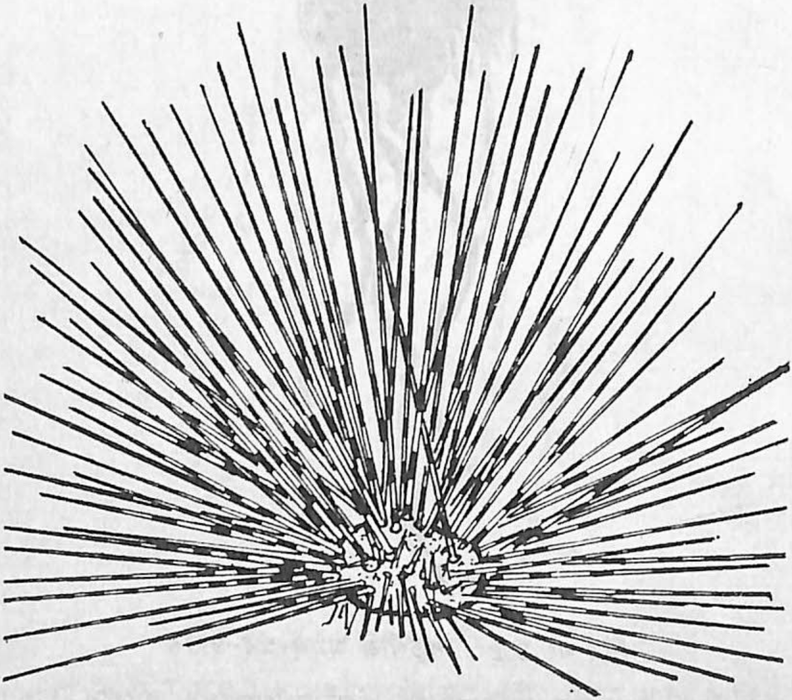
আমাদের দেশে কিংবা বহু বিদেশী গল্পে ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীতে যে সব সামুদ্রিক প্রাণী ভয়ঙ্কর বলে চিহ্নিত ও চিত্রিত হয়েছে তার মধ্যে অক্টোপাস ও হাঙরের স্থান সর্বাগ্রে। ভিক্টর হুগো



চিত্র নং 2.2 ঃ পর্তুগীজ ম্যান্-অব্-ওয়ার

তাঁর এক উপন্যাসে অক্টোপাসকে তো দেখিয়েছেন রাক্ষুসে দানব হিসেবে। স্কুইড নামে আর এক শ্রেণীর প্রাণী আছে যারা অক্টোপাসের সমশ্রেণীভুক্ত, কিন্তু আকারে বড়। অক্টোপাসের শরীর (চিত্র নং 2.4) গোলাকার ও নরম এবং তার থেকে বেরিয়ে আসে লম্বা লম্বা আটটা হাত কর্ষিকার মত। এদের ভয়াবহ আকৃতির জন্য এরা শয়তানমাছ হিসেবে পরিচিত।

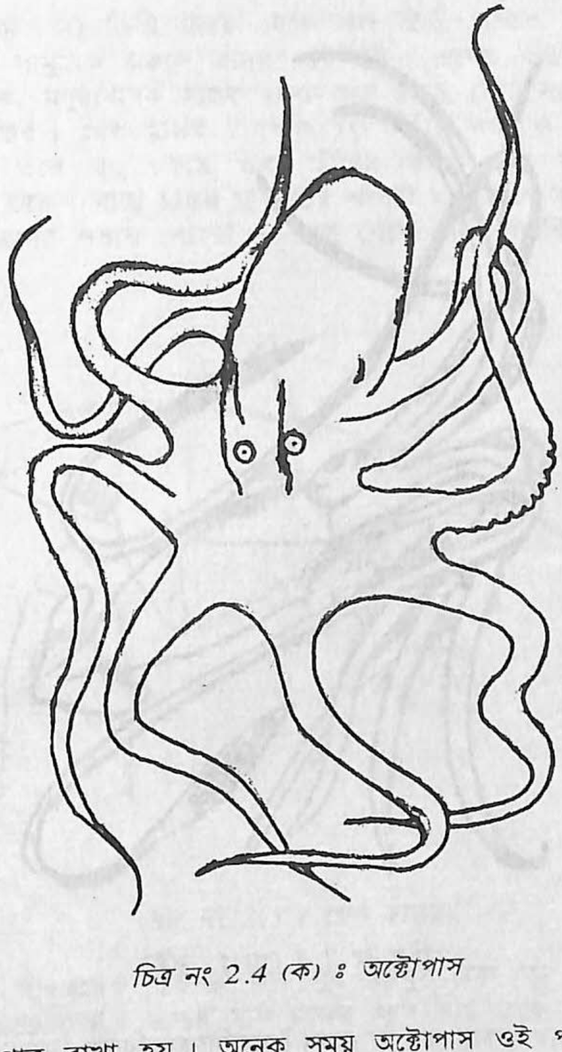
এরা যতই ভয়ংকর হিসেবে চিহ্নিত হোক না কেন, এদের না চটালে এরা মানুষকে আক্রমণ করে না। তবে প্রয়োজন হলে শক্ত চোয়াল দিয়ে মানুষকে কামড়ে ধরে। ওদের মুখনিঃসৃত লালার বিষ শত্রুদেহে সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ এই বিষ স্নায়ুতন্ত্রে কাজ করে। বিষক্রিয়ায় অসুস্থতার যে সব লক্ষণ ফুটে ওঠে তা হল শারীরিক অসাড়তা, শিহরণ, মুখ শুষ্ক হওয়া, বমনেচ্ছা, শ্বাসকষ্ট, এমন কি মৃত্যু। এদের শরীরে আত্মরক্ষার দুটো যন্ত্র আছে। সে খুব দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে পারে শরীরের পশ্চাদংশের কুপীর সাহায্যে। এছাড়া শরীরের পেছনের নিম্নাংশে স্থিত একটা থলি



চিত্র নং 2.3 ঃ সমুদ্রশল্লকী

থেকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে একটা কালো জলীয় পদার্থ বের করে জলকে ঘোলা করে দিয়ে এরা পালিয়ে যায়। তারা নিজেদের গায়ের রঙ স্বচ্ছন্দে পাল্টাতে পারে – কখনো তা হয় লাল, হয়ত পরক্ষণেই হলদে, খয়েরী বা নীল।

প্রাচীন কাল থেকেই কিন্তু অক্টোপাসের মাংস গ্রীক ও রোমানদের কাছে অতি সুখাদ্য। ইউরোপের বাজারে এখনও এদের মাংস বিক্রি হয়। ফিলিপাইন দেশের লোকেরা সন্ধ্যার মুখে বর্শা হাতে নিয়ে অক্টোপাস ধরার জন্য অপেক্ষা করে। যেই তাদের জলে দেখা যায়, তখন শক্তিশালী টর্চের আলোয় তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এবং তারপর বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে। জাপানে সমুদ্রের তলায় বিরাট



চিত্র নং 2.4 (ক) ঃ অক্টোপাস

মাটির পাত্র রাখা হয়। অনেক সময় অক্টোপাস ওই পাত্রে আশ্রয় নেয়। মাঝে মাঝে কিছু অক্টোপাস মেলে ওই পাত্র থেকে।

অক্টোপাস আকারে যত ছোট হয়, তার বিষ কিন্তু তত বেশি। বিদেশে অনেক সময় চিত্ত বিনোদনের জন্য ছোট অক্টোপাসকে মানুষের হাতের উপর দিয়ে হাঁটানো হয়। আর হাতটা যার সে অনেক সময়ই জানেনা ছোট প্রাণীর বিষ কত মারাত্মক হতে পারে। এ ব্যাপারে দু-একটা দুর্ঘটনাও ঘটে গেছে, তবে তা সমুদ্রের বাইরে। অক্টোপাসের চোখ বেশ পরিণত, কর্ষিকাগুলির সাহায্যে সে নিপুণভাবে কাজ করতে পারে, আর অমেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে, সে



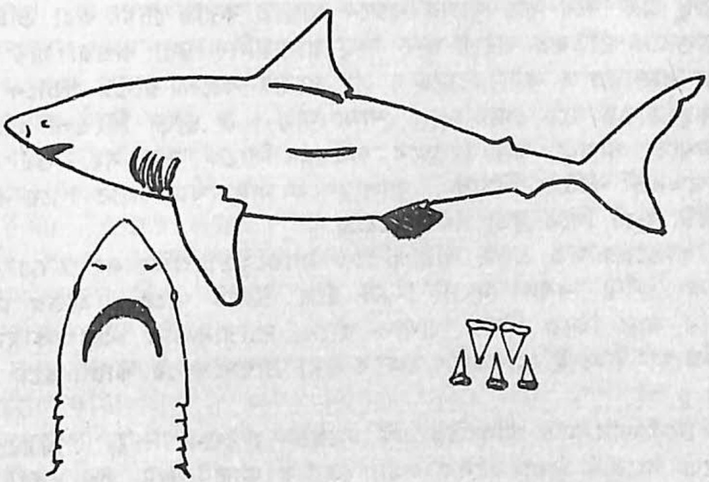
চিত্র নং 2.4 (খ) ঃ স্কুইড

যা বুদ্ধি ধারণ করে তা যে কোন বৈজ্ঞানিকের বিস্ময় উদ্রেক করে।

অক্টোপাসের মত স্কুইডও অমেরুদণ্ডী প্রাণী। সাধারণতঃ লম্বাটে ধরনের এই প্রাণীর দৈর্ঘ্য 30 থেকে 60 সেন্টিমিটার। এদের লম্বা কর্ষিকার সংখ্যা 10। দৈত্যাকার স্কুইড 20 মিটার অবধি লম্বা হতে পারে। এরা খুবই লড়াই প্রিয়। মানুষকে আক্রমণের কায়দায় এদেরও অক্টোপাসের খুবই মিল আছে।

প্রায় 300 জাতের হাঙর সমুদ্রে চলাফেরা করে। এরা সকলেই কিন্তু বিপজ্জনক নয়। এদের মধ্যে মাত্র দু ডজন বিভিন্ন শ্রেণীর হাঙর আছে যাদের থেকে মানুষের প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা থাকে।

সাধারণতঃ 40 ডিগ্রি উত্তর থেকে 40 ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী সামুদ্রিক অঞ্চলে এদের গতিবিধি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক, মনুষ্যখাদক হাঙর হলো শ্বেত হাঙর (চিত্র নং 2.5) ও ব্যাঘ্র হাঙর। শ্বেত হাঙর 7 থেকে 10 মিটার লম্বা ও মাঝসমুদ্রে থাকে। তবে বহু ক্ষেত্রে ওরা তীরের কাছে এসে সাঁতারুদের আক্রমণ করে। ব্যাঘ্র হাঙর ছাই ছাই খয়েরী হয়, পাশে কালো লম্বা দাগ। এদের স্বভাব নোংরা – ধাতু থেকে মানুষ সবকিছুই খেয়ে



চিত্র নং 2.5 ঃ শ্বেত হাঙর

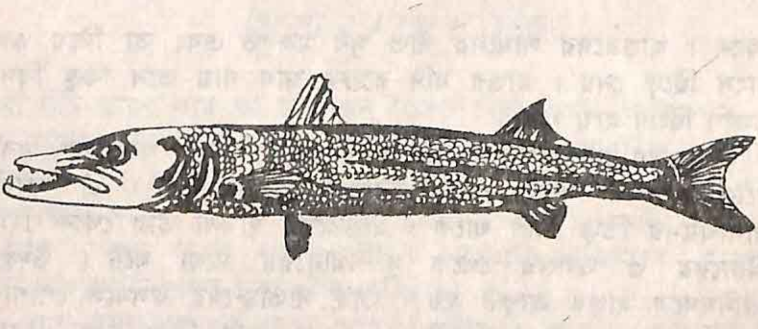
ফেলে। হাঙরদের সামনের দাঁত খুব মজবুত এবং তা দিয়ে ওরা মাংস ছিড়ে নেয়। হাঙর যদি রক্তের স্বাদ পায় তবে কিন্তু বিপদ তক্ষুণি দ্বিগুণ হয়ে যায়।

হাঙরদের আক্রমণের যে সব খবর পাওয়া গেছে, তার প্রায় সবই ঘটেছে সকাল দশটা থেকে বিকেল ছটার মধ্যে। ঐ সময়ই স্নানার্থীদের ভিড় বেশি থাকে। হাঙরদের হামলা তীর থেকে 100 মিটারের ও জলস্তর থেকে দু মিটারের মধ্যে ঘটে। উজ্জ্বল জিনিসপত্রে হাঙর আকৃষ্ট হয়। তাই সাঁতারুদের ঝলমলে পোশাক এদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এদের বর্শা নিয়ে বিদ্ধ করার এলোপাতাড়ি চেষ্টা না করাই ভাল। কিংবা আত্মরক্ষা করতে গিয়ে এদের লেজ ধরে টানাটানির চেষ্টা না করাই বিধেয়। অনেক

হাঙরের পাখনায় কাঁটা থাকে এবং তাদের গাও খুব রুক্ষ। এদের সঙ্গে মানুষের শরীরের ঘর্ষণে কেটে গিয়ে রক্তপাত অনিবার্য; আর একবার রক্তের স্বাদ পেলে হাঙরের চেহারাই পাল্টে যায়। সাধারণতঃ হামলা করার আগে আক্রান্ত ব্যক্তির চারিদিক এরা পরিক্রমা করে। এই সুযোগে অনেক সময় তীরে পৌছে যাওয়া যায়, কিংবা কাছাকাছি কোন নৌকা থাকলে তাতে উঠে পড়া যায়। এসব ক্ষেত্রে ছন্দোবদ্ধভাবে সাঁতার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, জলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে হাঙর সচেতন হয়ে উঠবে। যদি একান্তই হাঙরের মুখোমুখি হতে হয়, তবে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে বর্শাজাতীয় কিছু অস্ত্র দিয়ে তার মুখের সামনে আঘাত করার চেষ্টা করা উচিত। হাঙরকে প্রতিহত করার জন্য কিছু রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায় এবং তা বাজারজাত করা হয়েছে। এই দ্রব্যের কালো রঙের প্রভাবে কিছু কিছু হাঙর হটে গেছে বলে শোনা যায়। এ ছাড়া শিংওলা হাঙরও দেখতে পাওয়া যায়। তবে তাদের শিংকে ভয় নয়, ভয় তার সম্মুখবর্তী কাঁটার বিষকে। জাল থেকে মাছ বের করতে গিয়ে এদের কাঁটা ফুটে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে।

হাঙরের মত একই পরিস্থিতিতে ব্যারাকুডা (চিত্র নং 2.6) নামে এক শ্রেণীর বিশাল মৎস্য হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। হাঙর যেমন বার বার ফিরে ফিরে আঘাত হানে, ব্যারাকুডার কিন্তু 'কামারের এক ঘা'। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা প্রাণসংশয়ের কারণ হয়ে উঠে না।

টর্পেডোর মত আকৃতির এই মাছেরা 1 থেকে $3\frac{1}{4}$ মিটার লম্বা হতে পারে। এরা অনেক সময় জেলের জাল কেটে মাছ বের করে আনে। আটলান্টিকের যে অংশ ব্রাজিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের

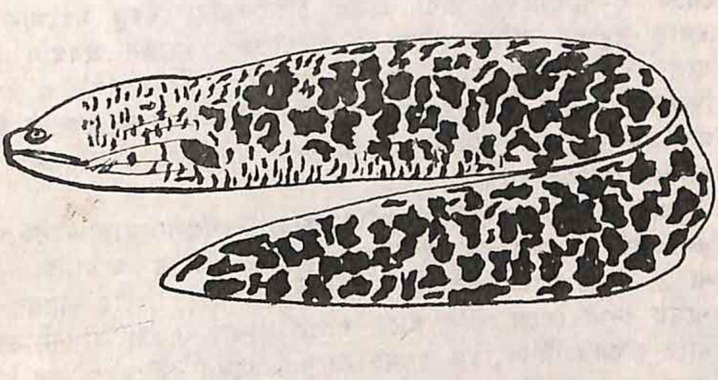


চিত্র নং 2.6 ঃ ব্যারাকুডা

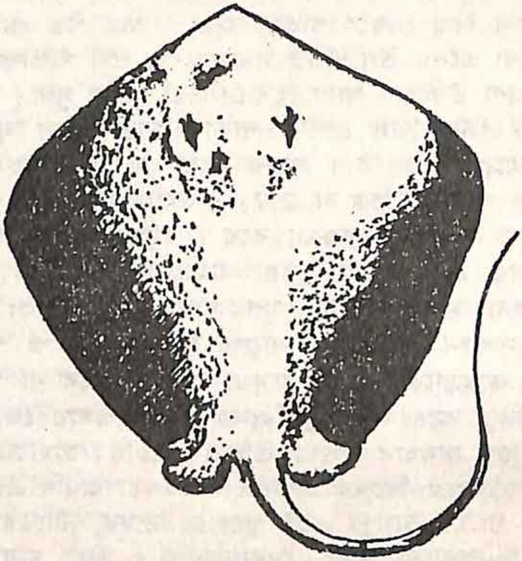
ক্যারোলিনা পর্যন্ত প্রসারিত, সেই অংশে এরা ঘোরাফেরা করে। এরা চলমান কিছু দেখলে ধাওয়া করে। আর শক্ত চোয়াল ও তীক্ষ্ণ দাঁতের জন্য এদের উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকলে সাঁতারুদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। খাদ্য হিসাবে এরা অবশ্য সুস্বাদু নয়।

বাইশটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাকাল মাছ সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। এদের চেহারা সর্পাকৃতি। এদের মধ্যে যে শ্রেণী সহজলভ্য তাদের নাম মোরে পাকাল (চিত্র নং 2.7)। উষ্ণমণ্ডলীয় জলে এরা পরিক্রমা করে। এরা মানুষকে আক্রমণ করে। সমুদ্রের জলের তলায় থাকতে ভালবাসলেও এরা মুলত ডুবন্ত পাহাড়ের গর্তে বা প্রবালে বাস করে। অন্য মৎস্য তাদের মূল খাদ্য। সাধারণতঃ রাত্রে তারা খাবারের সন্ধানে বের হয়। সাপের মত বিষদাঁত ও শক্ত চোয়ালের জন্য এরা কামড়ানোর প্রচন্ড ক্ষমতা রাখে। তবে না ক্ষ্যাপালে এরা মানুষকে কিছু করে না। ডুবুরিদের জলের তলায় কোন গর্তে হাত দেবার আগে সাবধান হওয়া উচিত। ছোট চোয়ালের তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে নিজের প্রাণনাশ না হওয়া অবধি এরা মুখ খুলতে চায় না। গায়ের চামড়া এতই পুরু যে এদের শরীরের বেশি গভীরে ছুরি প্রবেশ করানো খুবই মেহনতসাধ্য। এরা সাধারণতঃ শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে নেয়। তাই প্রায় সব ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তির প্রচুর রক্তপাত ঘটে।

রজ্জু মৎস্যের মেরুদণ্ডের চারপাশে বিষে ভর্তি খোঁচা খোঁচা হাড়ের কাঁটা থাকে। এদের চ্যাপটা শরীরে লেজ পেশীযুক্ত। এরা সমুদ্রের পলির মধ্যে ঢুকে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এদের চেহারা অতি নিরীহ (চিত্র নং 2.8)। কিন্তু যদি ভুলক্রমেও এই মাছের গায়ে হাত লেগে যায় তবে এদের মেরুদণ্ডের কাঁটায় আহত হবার সম্ভাবনা



চিত্র নং 2.7ঃ মোরে পাকাল

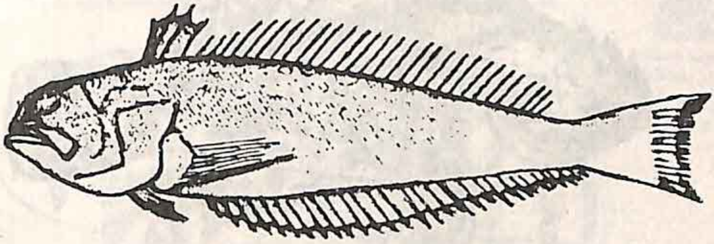


চিত্র নং 2.8 ঃ রজ্জু মৎস্য

প্রবল। নাতিগভীর জলে সাঁতার কাটার সময় রজ্জু মৎস্যের কাঁটায় হৃদয় ভেদ করে যাবার ঘটনাও ঘটেছে। এদের দংশন যথেষ্ট বেদনাদায়ক এবং এর ফলে বমি, অতিরিক্ত মলত্যাগ, চামড়া লাল হয়ে ফুলে ওঠা, অনিয়মিত হৃদ্‌স্পন্দন, অবসন্নতা, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

উইভার মাছ (চিত্র নং 2.9) অত্যন্ত বিষাক্ত। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে এদের চলাফেরা। রজ্জু মৎস্যের মত এরাও সমুদ্রের বালির ভেতর ঢুকে থাকে। নিজের অবস্থান বিপন্ন হলে এরা আক্রমণ করতে পেছপা হয় না। এদের পিঠ ও পেটের দিকের পাখনায় বিষ মাখানো থাকে। আর তার কাঁটাগুলো ছুঁচের মত সরু। এদের কাঁটার খোঁচার ফলে মানুষ যন্ত্রণায় চেতনা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে পারে।

জেব্রার মত সারা গায়ে কাটা কাটা দাগওলা মাছকে জেব্রামাছ বলা হয়। এদের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক (চিত্র নং 2.10)। তার উপর এদের গতি অত্যন্ত মন্থর। তাই সমুদ্রের জলে এদের দেখা গেলে খালি হাতে ধরতে যাবার একটা বাসনা জাগতে পারে। আর বিপদ ঠিক তখনই আসে। এদের শরীরে যে সব পাখনা আছে তা সূক্ষ্ম কাঁটায় ভরা আর তার চারপাশে মজুত থাকে বিষের থলি। এদের কাঁটা ফুটে যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র হয়। এমনকি গ্লাভস

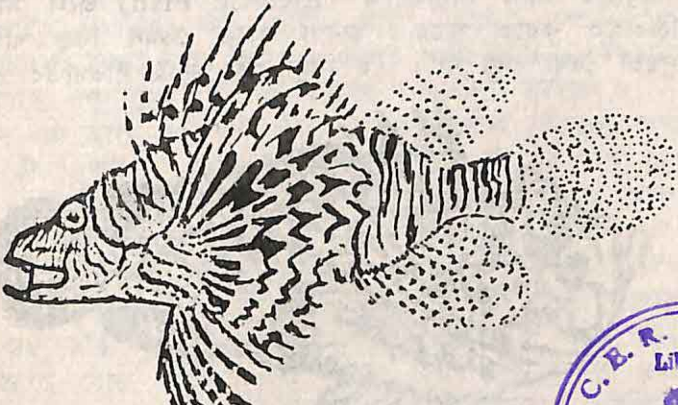


চিত্র নং 2.9 ঃ উইভার মাছ

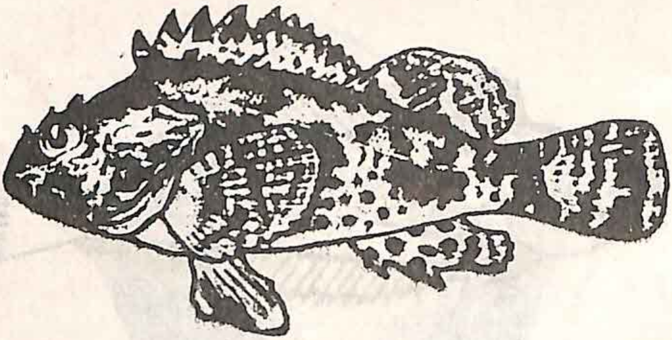
পরেও এদের ধরতে যাওয়াও বিপজ্জনক।

বিভিন্ন আকৃতি, গঠন ও রঙের বৈচিত্র্যে ভরা বিছে মাছ (চিত্র নং 2.11)। এরা প্রধানতঃ থাকে সমুদ্রের তলায়, পাহাড়ের গহ্বরে বা প্রবালের গর্তে। বহুরূপীর মত রঙ বদল করার ক্ষমতা এদের আছে। এদের শরীরের সূক্ষ্ম কাঁটার স্পর্শে তীব্র যন্ত্রণা হয়।

পাথুরে মাছ (চিত্র নং 2.12) দেখে মনে হয় কে যেন ওদের শরীরে টুকুরো টুকুরো পাথর বসিয়ে দিয়েছে। এদের পিঠের পাখনার কাঁটাগুলো বেশ শক্ত ও তীক্ষ্ণ। এই কাঁটা টেনিস জুতোর তলা স্বচ্ছন্দে ভেদ করে যেতে পারে। শত্রুর শরীরে বিষঢালার সরঞ্জাম এদের দেহে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠেছে। এদের বিষে



চিত্র নং 2.10 ঃ জেব্রা মাছ



চিত্র নং 2.11 ঃ বিছে মাছ

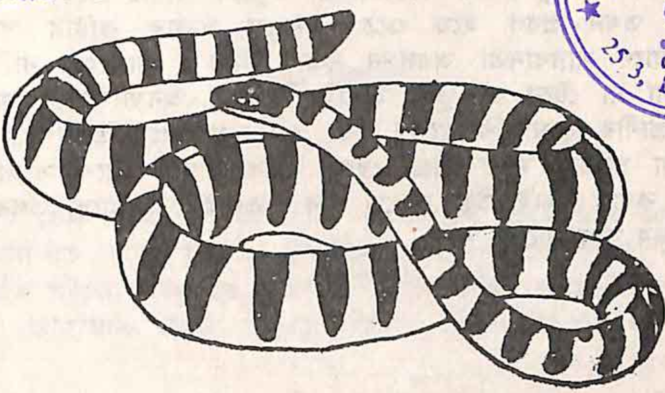
শরীরে তীব্র যন্ত্রণা হয়। পাথুরে মাছই একমাত্র মাছ যার বিষের প্রতিষেধক বের হয়েছে।

অধিকাংশ সামুদ্রিক সাপ 1 থেকে 1.4 মিটার লম্বা (চিত্র নং 2.13)। প্রত্যেক সাপেরই বিষ আছে, তবে এদের বিষদাঁতগুলো অত্যন্ত দুর্বল। এটা মানুষের পক্ষে ভালই হয়েছে, কারণ কিছু কিছু সামুদ্রিক সাপের বিষ কেউটের চেয়েও বেশ কয়েকগুণ তীব্র। সাধারণতঃ এদের মেজাজ শান্ত, তবে কেউ কেউ আছে যারা বিরক্ত করলে রুখে দাঁড়ায়। অধিকাংশ সর্পদংশনের ঘটনা ঘটে নদীমুখে। অনেক সময় জালের ভেতর থেকে মাছ ধরতে গিয়েও জেলেরা সাপের কামড় খায়। সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে সাপ কামড়ে দিয়েছে—এরকম ঘটনাও কিছু কম নেই।

সামুদ্রিক প্রাণী বিদ্যুৎরশ্মি (Electric Fish) জলে মানুষকে তড়িতাহত করতে পারে। অবশ্য তাতে তেমন কিছু শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয় না। এই বিদ্যুৎরশ্মি খুবই ধীরগতির প্রাণী।



চিত্র নং 2.12 ঃ পাথুরে মাছ



চিত্র নং 2.13 ঃ সামুদ্রিক সাপ

সাধারণতঃ সমুদ্রতলে এরা থাকে। মোটামুটি এক জায়গায় অবস্থান করতে এরা ভালবাসে। এদের শরীরের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সামনের দিকে থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ জলে 220 ভোল্ট বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চার করতে পারে। বড় বড় আকৃতির বিদ্যুৎরশ্মি একজন বয়স্ক মানুষকে অল্পসময়ের জন্য তড়িতাহত অবস্থায় রাখার ক্ষমতা রাখে।

উপরে যেসব প্রাণীর উল্লেখ করা হলো তারা ছাড়াও মৎস্যজাতীয় আরও বহু প্রাণী আছে যাদের স্পর্শে মানুষ বিভিন্নভাবে আহত হতে পারে। এদের মধ্যে উল্লেখ্য,–ইঁদুরমাছ, বেড়ালমাছ, শঙ্খশামুক ও বিভিন্ন ধরনের অমেরুদন্ডী সরীসৃপ।

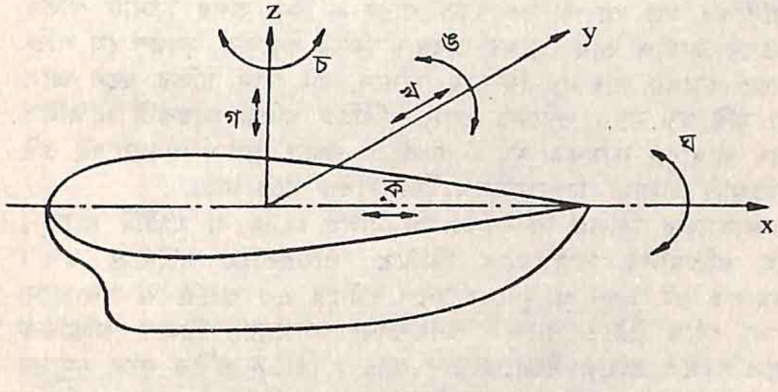
এখন প্রশ্ন হলো এই সব জীবজন্তুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কী ? ভয় না পেয়ে সামুদ্রিক প্রাণিদের সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখা উচিত। এইসব ক্ষতিকারক প্রাণীর থেকে কিভাবে বিপদ আসতে পারে, সমুদ্রের জলের নিত্য কারবারীদের অবশ্যই জেনে রাখা দরকার। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এদের অধিকাংশই মানুষের গাফিলতির জন্য ঘটে। ওইসব প্রাণীকে আমরা যেমন ভয় করি, ওরাও আমাদের তেমন ভয় করে, তাই কেউই নিজে আগে থেকে মারমুখী হয়ে উঠতে চায় না। জলের ভেতর অপরিচিত কিছু দেখলে তা এড়িয়ে যাওয়াই বিধেয়। ডুবুরিদের নিজেদের পোশাকের ব্যাপারেও অত্যন্ত সচেতন হওয়া উচিত– এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল জিনিসই তাদের ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়া বিভিন্ন দিকের জলজ প্রাণীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা

দরকার। জলের তলায় স্রোতের প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে কিন্তু সমূহ বিপদ। বহু প্রকার কাঁটাবিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণীর সঙ্গে ধাক্কার আশঙ্কা তখন প্রবল হয়ে ওঠে। সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় সমপরিমাণে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সাগরের বালির মধ্যে পা না টেনে তা তুলে হাঁটাই বিধেয়। অবস্থাবিশেষে, যদি কোন প্রাণীর মুখোমুখি হতেই হয় তবে ভয় পেয়ে এলোপাতাড়ি হাত না চালিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাকে সামনে থেকে সজোরে আঘাত করার কথাই চিন্তা করতে হবে। কথাই তো আছে, ভগবান সাহসীদের সঙ্গে থাকেন।

৩

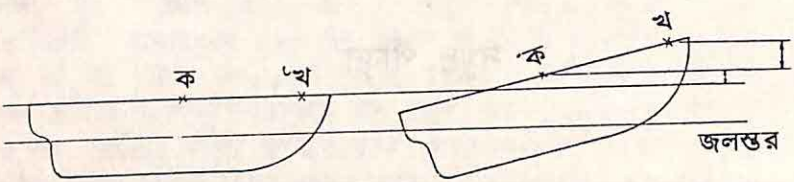
সমুদ্র পীড়া

সমুদ্র স্রোত আর ঢেউয়ের তালে তালে জল কেটে চলে জাহাজ —আন্দোলিত হতে হতে। ত্রিমাত্রিক আয়তনে যে কোন বস্তুর স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে ছয় প্রকারে—তিনটি নির্দিষ্ট কক্ষের চলন ও ঘূর্ণন। জাহাজকে একটা ঋজুবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করলে এই ছয়



ক	=	দৈর্ঘ্য চলন	=	x-কক্ষের চলন	(surging)
খ	=	প্রস্থ চলন	=	y-কক্ষের চলন	(swaying)
গ	=	উত্তোলন	=	z-কক্ষের চলন	(heaving)
ঘ	=	প্রস্থ দোলন	=	x-কক্ষের ঘূর্ণন	(rolling)
ঙ	=	দৈর্ঘ্য দোলন	=	y-কক্ষের ঘূর্ণন	(pitching)
চ	=	দৈর্ঘ্য ঘূর্ণন	=	y-কক্ষের ঘূর্ণন	(yawing)

চিত্র নং 3.1 ঃ জাহাজের বিভিন্ন গতি

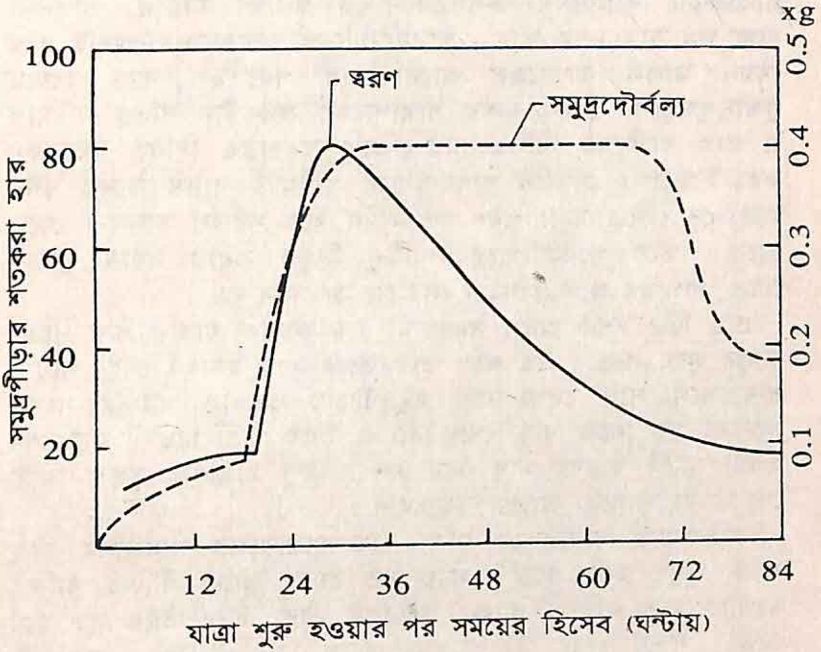


চিত্র নং 3.2 ঃ জাহাজের ওঠানামা

ভাবে তার স্বস্থান থেকে বিচ্যুতি সম্ভব। জাহাজের ক্ষেত্রে তিনটি নির্দিষ্ট কক্ষের গতির সংজ্ঞা চিত্র নং 3.1 এ দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে উত্তোলন, প্রস্থদোলন ও দৈর্ঘ্যদোলনের ফলে জাহাজ ঘড়ির দোলকের মত আন্দোলিত হতে থাকে। কিন্তু অপর তিনটি গতির প্রভাবে জাহাজ তার আগের অবস্থায় ফিরে আসেনা, কারণ যে শক্তি তাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনবে, এই তিন গতির ফলে জলে তা সৃষ্টি হয় না। তরঙ্গের প্রভাবে বিভিন্ন গতির কয়েকটি সম্মিলিত হয়ে জাহাজে কার্যকর হয়। একমাত্র একান্ত আদর্শ অবস্থাতেই এই গতিগুলি আলাদা আলাদাভাবে ক্রিয়াসাধক হতে পারে।

জাহাজের বিভিন্ন জিনিসপত্র তা মালই হোক্ বা যাত্রীই হোক্, এই গতিগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্নভাবে গতিপ্রাপ্ত হয়। ক্রমাগত ওই চলন ও ঘূর্ণনের ফলে শরীরে এক অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্য দানা বেঁধে উঠতে থাকে। জাহাজের কম্পনের পরিমাপ অতিরিক্ত হলে শরীরে সহ্যের সীমাতে টান পড়ে। বিভিন্ন গতির ফলে সমুদ্রের মধ্যে এই অসুস্থতাবোধ সমুদ্রপীড়া নামে অভিহিত। প্রথম যেদিন সমুদ্রে জাহাজ ভেসেছিল, সেদিন থেকেই যাত্রীরা ওই পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে চলেছে।

শারীরিক অস্বস্তির প্রথম যে সব উপসর্গ দেখা যায় তা হল বমিবমিভাব এবং / অথবা বমি করা। অন্য লক্ষণগুলোর মধ্যে থাকে মাথাব্যথা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা, শীতে ঘাম হওয়া, মুখ বর্ণহীন হওয়া এবং ক্রমান্বয়ে থুতু ফেলা। সমুদ্র পীড়ার কারণ হিসেবে নানা তত্ত্বের উপস্থাপনা হয়েছে। তার মধ্যে আছে ঃ (১) স্বাভিভাব, (২) জাহাজের অবিরত কম্পনে চোখের ক্লান্তি, (৩) জাহাজের তালে তালে উদর ও অন্ত্রের ক্রমান্বয়ে গতিপ্রাপ্ত হওয়া এবং (৪) শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার ইন্দ্রিয়াদির বিশৃঙ্খলা। এর মধ্যে শেষোক্ত



চিত্র নং 3.3 ঃ সমুদ্রপীড়ার পরিসংখ্যান

কারণটি বেশি গ্রহণযোগ্য। কানের দুই নালীর ভেতরে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর খন্ড শরীরের সমতামূলক সামঞ্জস্য বজায় রাখে। এছাড়া আবর্তিত ত্বরণকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার জন্য আছে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী। এই সব ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় জাহাজের উল্লম্বগতিই সমুদ্রপীড়ার প্রধান কারণ। জাহাজের উত্তোলন ও দৈর্ঘ্যদোলনের উপর নির্ভর করে তার উপর অধিষ্ঠিত কোন বস্তুর উঠানামা এবং এ গতির পরিমাণ নির্ভর করে জাহাজের কেন্দ্রস্থল থেকে বস্তুর দূরত্বের উপর (চিত্র নং 3.2)। জাহাজের সামনে থাকা কোন যাত্রী মাঝখানে থাকা ব্যক্তির চেয়ে দ্বিগুণ গতিপ্রাপ্ত হতে পারে। চিত্র নং 3.2 এ দেখা যায় যে জাহাজের

মধ্যস্থলে ক-য়ের স্থানচ্যুতি সামনের খ-য়ের চেয়ে অনেক কম। মানুষকে সাগরের বুকে অস্বস্তিতে আচ্ছন্ন করতে জাহাজের অন্যান্য গতিগুলির ভূমিকা নিয়ে এখনও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে আসা যায়নি।

সমুদ্রপীড়ার কারণ অনুসন্ধান ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে সমুদ্রযাত্রীর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে গত চার দশক ধরে। গবেষণাগারের জলাধারে তরঙ্গসৃষ্টি করে যেমন মডেল জাহাজের আরোহীদের পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, তেমন সাগর পারাপারের জলতরীর গতির পরিমাপ ও তার যাত্রীদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অবস্থারও নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যেখানে গবেষণাগারে পরীক্ষার ব্যাপ্তি কয়েক ঘন্টা মাত্র, সে ক্ষেত্রে সমুদ্রে বেশ কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। তবে গবেষণাগারে সবকিছু নিখুঁত করার পর্যাপ্ত সুযোগ মেলে, সাগরের জলে ভাসমান জাহাজে তা সম্ভব নয়।

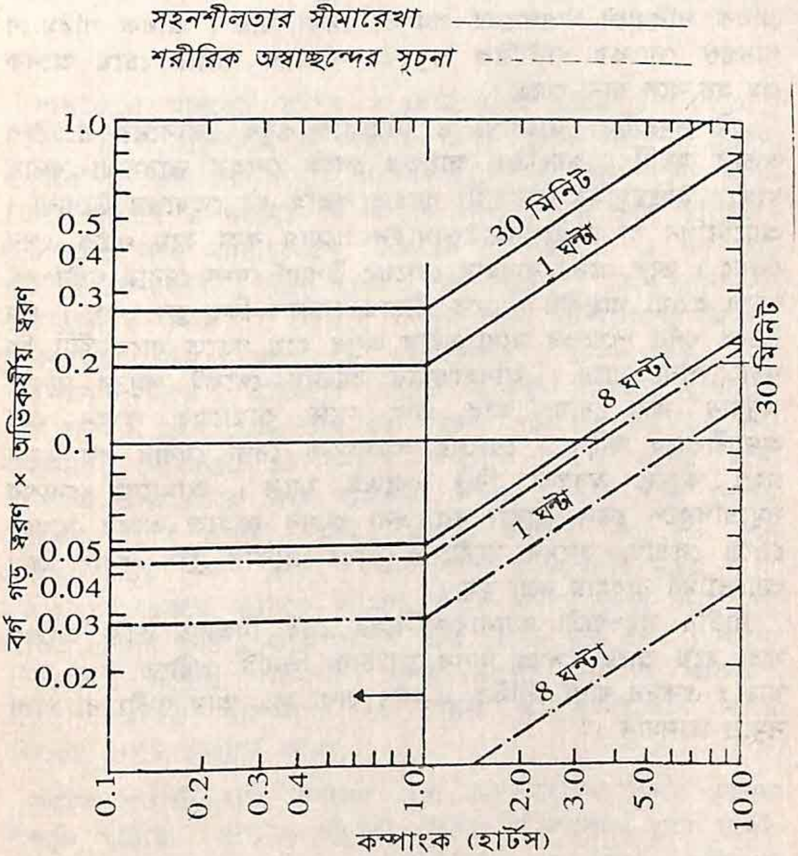
প্রায় তিন দশক আগে সমুদ্রগামী এক জাহাজ যাত্রার পরে পরেই ঝড়ের মুখে পড়ে। এর ফলে তার উল্লম্ব ত্বরণ হঠাৎই বেড়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা 20 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 40 এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝড় শেষ হওয়া মাত্রই ত্বরণের মাপ কমে এল। কিন্তু যাত্রীদের সুস্থতা ফিরে পেতে সময় লাগলো আরও কিছু বেশি।

সমুদ্রযাত্রায় সাধারণতঃ দেখা যায় যাত্রারম্ভের সঙ্গেসঙ্গেই কিছু ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। সময় যত যেতে থাকে পীড়িত ব্যক্তির সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। তারপর তারা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ সেরে উঠতে সময় লাগে দিন পাঁচেক। আর এই পাঁচদিন যাত্রীর অবস্থা হয় প্রাণান্তকর। পেটে প্রায় কিছুই থাকতে চায় না, সব সময়ই একটা গা বমি বমি ভাব। তার উপর যদি মাথা ধরা, গা হাতে পায়ে ব্যথা থাকে তবে তো কথাই নেই। ঘুমের বিশৃঙ্খলার জন্য অস্বস্তি আরো বেশি হয়।

জাহাজের ত্বরণের মাপ যদি অভিকর্ষীয় ত্বরণের শতকরা 10 ভাগের বেশি হয়, তবে শরীরকে যাত্রার উপযোগী করে তুলতে আরও বেশি সময় লাগবে। কম্পনে মানুষের সহনশীলতার মাপকাঠি চিত্র নং ৩.4 এ দেখানো হয়েছে। মনে রাখা দরকার জাহাজে যাওয়া ছাড়াও জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে মানুষকে বহু ধরনের কম্পনের সম্মুখীন হতে হয়। উল্লেখ্য, সবরকম কম্পনের এই আন্তর্জাতিক সীমারেখায় নিম্ন কম্পাংকের সীমা নির্ধারিত হয়েছে সমুদ্রপীড়ার পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর। যাত্রাশেষে হওয়া মাত্রই যে যাত্রীরা এই পীড়ার হাত থেকে রেহাই পায় তা নয়। সাধারণতঃ এর প্রভাব কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক হতে একটা দিন লেগে যায়। অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে এর ব্যাপ্তি আরও অনেক বেশি। তীরে নামার

পর তিন দিন পর্যন্ত তারা বিছানায় শুয়ে অনুভব করে জাহাজের দোলদোলানি।

সব যাত্রীর ক্ষেত্রে একই রকমের প্রতিক্রিয়া হয় না। সাধারণভাবে একটা ধারণা আছে প্রায়ই যারা সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তাদের শরীরে সমুদ্রপীড়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এ ধারণাটা সব সময়



চিত্র নং 3.4 ঃকম্পনে মানুষের সহনশীলতার সীমা

ঠিক নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা সাধারণ যাত্রীর তুলনায় ভাল থাকে। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পীড়ায় অসুস্থ হবার সম্ভাবনা কমে আসে। বধির ও মুক এবং যে সব ব্যক্তির দেহের ভারসাম্যের ইন্দ্রিয়গুলো ব্যাহত হয়েছে, তারা কিন্তু সমুদ্রপীড়ায় একেবারেই আক্রান্ত হয় না। পুরুষদের থেকে নারীরা তুলনায় বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। জাহাজে মাদকদ্রব্য সুলভ। তাই যাত্রীদের মধ্যে অধিক পরিমাণে মদ্যপানের প্রবণতা দেখা যায়। অধিক পরিমাণে পানগ্রস্ত লোকের শারীরিক অসুস্থতা সাধারণ যাত্রীর চেয়ে অনেক কম হয় বলে জানা গেছে।

এই সমুদ্রপীড়া আরোগ্য ও নিবারণে ওষুধ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টার অভাব হয়নি। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার ইন্দ্রিয়গুলির ভারসাম্য ব্যাহত করাই এই ভেষজের উদ্দেশ্য। অ্যাট্রোপিন বা ডাইফেনহাইড্রামাইন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এসব ক্ষেত্রে। তবে এদের ব্যবহার রোগের উপসর্গ দেখা দেবার ঘন্টা দুই আগে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে পীড়ার প্রকোপ কিছু হ্রাস পায়। প্রশ্ন উঠবে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এটা কি করে জানা যাবে। আবহাওয়ার আভাস থেকেই সমুদ্রর অবস্থা অনুমান করা যায়, আর তার সঙ্গে জাহাজের কম্পন তো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রোগের লক্ষ্মণগুলো দেখা দেবার পর ওষুধ গ্রহণ করলে অসুস্থতা কিন্তু বেড়েই যাবে। আমাদের দেশের সমুদ্রোপকূলে তেল উত্তোলনের জন্য যেসব জাহাজ আরব সাগরে ভেসে বেড়ায়, তাদের যাত্রীদের বমির প্রকোপ হ্রাস করার জন্য অ্যাভোমিন ব্যবহার করা হয়।

প্রাচীন সমুদ্রযাত্রী অ্যানারকাসিসের সেই বিখ্যাত উক্তি আজও সত্য হয়ে আছে—"সমগ্র মানব জাতিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ একদল যারা জীবিত, একদল যারা মৃত, আর তৃতীয়ারা যারা সমুদ্রে ভাসমান।"

৪

সাগরজলে ত্রাণ

সাগরজলে মানুষের ত্রাণের প্রচেষ্টায় প্রথম নামে চীন। তারা 1737 সালে সমুদ্রতটে জীবনরক্ষা সংস্থা স্থাপন করে। এরপর হল্যান্ডে ও তার অল্প পরে ইংল্যান্ডে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। 1786 খৃষ্টাব্দে এ ধরনের যে সংস্থার আমেরিকায় প্রথম আবির্ভাব ঘটে তার নাম ম্যাসাচুসেটস্ হিউম্যান সোসাইটি। এ সব কটি সমিতিই বেসরকারী। তীরে এদের স্টেশন থাকত। কোন নৌকা বা জাহাজডুবির খবর এসে পৌঁছলে এখানে সতর্ক ধ্বনি বেজে উঠত। অবিলম্বেই কিছু স্বেচ্ছাসেবী ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যেত লাইফবোট নিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে জলযান ডুবে যেত; তাই এই অকরুণ পরিবেশে উদ্ধারের জন্য যাত্রীবাহী নৌকাগুলোও বিপদের সম্মুখীন হত। এদের মধ্যে অনেকেই আর তীরে ফিরে আসেনি। তবুও বিপদে সাড়া দেবার লোকের অভাব কখনো হয়নি। এছাড়া তীরের কিছু দূরে দূরে অসংখ্য কুটির নির্মাণ করে পরিচ্ছদ, খাদ্য ও জ্বালানি মজুত রাখা হত। কোনরকমে ভাসতে ভাসতে তীরে আসা ডুবন্ত জাহাজের নাবিক এইসব কুটিরে অনিশ্চয়তার হাত থেকে স্বস্তি পেত। অবশ্য এ জাতীয় সংস্থার কার্যকলাপ মূলত তীরেই সীমাবদ্ধ থাকত। ব্রিটেনে আজও ন্যাশানাল লাইফবোট অ্যাসোসিয়েসান নামে এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান আছে।

কয়েক শতাব্দী ধরে সাগরের জলে ত্রাণ কার্যের পন্থার অনেক বিবর্তন ঘটেছে। প্রত্যেক তটবর্তী দেশের এ ব্যাপারে তো যথেষ্ঠ দায়িত্ব আছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক প্রতিষ্ঠান (International Maritime Organisation, বা সংক্ষেপে IMO) আছে যারা বিভিন্ন দেশের ত্রাণকার্যের সমন্বয় ঘটান। ভারতীয় তটরেখায় মোট 18টা রেডিও স্টেশন আছে যারা বিপদ সঙ্কেত গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাকে তা জানিয়ে দেয়। যে সব প্রতিষ্ঠান সন্ধান ও উদ্ধারের কাজে জড়িত থাকে তারা হল নৌবাহিনী, উপকূলরক্ষীবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং বিভিন্ন বন্দর সংস্থা। নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর মূল দায়িত্ব যেমন শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা, তেমন উপকূলরক্ষীবাহিনী মূলত দেশের



প্লেট নম্বর 4.1 স্থলে দাঁড়ানো সীপ্লেন

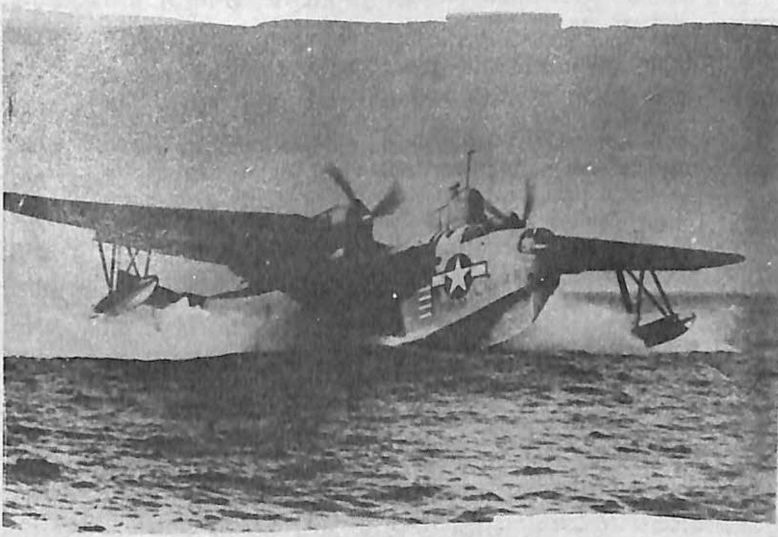
জলসীমাকে রক্ষা করে। জলপথে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীদের মোকাবিলা করাও এদের অন্যতম দায়িত্ব। তবে অধিকাংশক্ষেত্রে দেখা যায় যে এদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ সাগর জলে সন্ধান ও উদ্ধার। বিভিন্ন বন্দর কর্তৃপক্ষের বন্দরকে সবদিকে থেকে কার্যকর রাখা প্রধান কাজ হলেও, বিভিন্ন রকমের বিপদে তারা তাদের সামর্থ নিয়ে এগিয়ে আসে। উদ্ধারের কাজে নৌবাহিনীরও এক বিরাট ভূমিকা আছে। উপরোক্ত সব সংস্থার অধীনে থাকে বিভিন্ন ধরনের জলযান, হেলিকপ্টার ও উড়োজাহাজ।

কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা নির্ভর করে ঘটনার গুরুত্ব ও তীর থেকে দূরত্বের উপর। প্রথমে চেষ্টা করা হয় কি জাতীয় বিপদ ঘটছে। সে সম্পর্কে যতটা সম্ভব সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত থাকলে কালবিলম্ব না করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উদ্ধারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দ্রুততা ঘটনার গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল।

উন্নত দেশগুলোর দখলে অনেক উভচর হেলিকপ্টার ও সীপ্লেন আছে। ত্রাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ জলযানই দ্রুতগতিসম্পন্ন। তবুও হেলিকপ্টার বা উড়োজাহাজের চেয়ে তাদের সকলেরই গতি কম। তীর থেকে 300 মাইল পর্যন্ত হেলিকপ্টার যেতে পারে। সাগরে ত্রাণের কাজে সীপ্লেনই আদর্শ। তারা দীর্ঘসময়

ধরে অনুসন্ধান চালাতে পারে। এদের দ্বারা এমন সব উদ্ধারকার্য সংঘটিত হয়েছে যা প্রায় গল্পের মত।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উড়োজাহাজের পরিক্রমণ আর সাগরের অথৈ জলে সন্ধান চালানোর মধ্যে অনেক পার্থক্য। এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাবার সময় যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী উড়োজাহাজের দিক, উচ্চতা বা গতি প্রায়ই নির্দিষ্ট থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়া বাধা সৃষ্টি করে সন্দেহ নেই, তবুও সীপ্লেন যে পরিমাণ বিপদের ঝুঁকি নেয় এ তার তুলনায় কিছুই নয়। সমুদ্রের যে বিন্দু তার গন্তব্যস্থল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা স্থিরীকৃত নয়। সমুদ্রের ভেতর একাকীত্বে মানুষের দিশাহারা হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। নৌচালনে ক্রটির আশঙ্কা হলে জাহাজের ক্যাপ্টেন সবসময়ই তার গতিকে স্তব্ধ বা স্তিমিত করে তা সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়। কিন্তু উড়োজাহাজে এজাতীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলে পাইলটকে কিন্তু ক্রমাগত প্লেন চালিয়ে যেতে হয়। এর ফলে তার ভুল বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাই শুধু থাকে তাই নয়, তার জ্বালানির পরিমাণও আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে। কম্পাসে ডিগ্রির ভুল হলে একটা জাহাজ তার নির্দিষ্ট নিশানা থেকে মাত্র কয়েক মাইল ভুল পথে সরে যেতে পারে। কিন্তু বাতাসের গতিকে অবহেলা করলে একই ধরনের একটা প্লেনের ভ্রান্তির পরিমাপ ঘন্টায় একশ মাইলের বেশি হতে পারে, । তাছাড়া জাহাজে নোঙর করার ব্যবস্থা থাকে।



প্লেট নম্বর 4.2 ঃ সাগরজলে সীপ্লেন

আকাশে তো প্লেন ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে থাকতে পারে না। তাই সীপ্লেনের পাইলট জীবনমরণের সীমানায় দাঁড়িয়ে উদ্ধারকার্য চালিয়ে থাকেন।

সমুদ্রের মধ্যে কোন জাহাজ বিপদে পড়লে তারা বিপদ সঙ্কেত পাঠাতে থাকে। উপকূলের রেডিও স্টেশনে বা অন্য জাহাজের ব্রিজে তা বেজে ওঠে। এই বিপত্তি সাইরেনের কম্পাংক 500 কিলোহার্টস এবং 2182 কিলোহার্টসে শোনা যায়। এমনকি সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়তে গিয়ে বিপদে পড়লে উড়োজাহাজও সঙ্কেত ধ্বনি পাঠায়। কোন জাহাজের সঙ্কটের খবর পাওয়া গেলে সব জাহাজকে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হতে হবে। কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন এটা অবহেলা করলে তিনি আইনতঃ দণ্ডনীয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে তাঁর ছ মাস কারাদণ্ড বা 1000 টাকা জরিমানা কিংবা দুই-ই হতে পারে। এ ব্যাপারে একটাই অসুবিধে, তা হল বিপদের খবর অনেকেই পাবে এবং সকলেই ঘটনাস্থলে যাবার চেষ্টা করবে, অথচ সেখানে হয়ত একটা জাহাজের উপস্থিতিই যথেষ্ট। ঘটনাস্থল থেকে কোন জাহাজের অবস্থান অনেক দূরে হলে তার সাহায্যের হাত বাড়ানোর দরকার হয় না। অনেক সময় বিপদগ্রস্ত জাহাজ থেকেই খবর পাওয়া যায় যে যথেষ্ট সাহায্য এসে পৌছে গেছে, আর কোন সহায়তার প্রয়োজন নেই।

কম্পিউটারের যুগে আজকাল এ ব্যাপারে অনেক উন্নতি হয়েছে। অবশ্য এখনও তা সীমিত আছে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে। নিউইয়র্ক বন্দরে প্রত্যেক জাহাজ তার বন্দর ছাড়ার সময় ও যাত্রা পথের পরিকল্পনা উপকূলরক্ষীবাহিনীকে জানিয়ে দেয়। এ তথ্য কম্পিউটারে পরিবেশিত হয় ও তার স্মৃতিতে (memory) ধরা থাকে। কোন জাহাজের বিপত্তির সংবাদ উপকূলরক্ষীবাহিনীর কাছে এসে পৌছলে, কম্পিউটারের পর্দায় ওই সময়ে বিভিন্ন জাহাজের অবস্থিতির চিত্র দেখে নেওয়া হয়। প্রয়োজন অনুসারে সঙ্কটাপন্ন জাহাজের নিকটবর্তী এক, দুই বা তিনটি জাহাজকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে বলা হয়। এর ফলে বহু জাহাজের আর একই জায়গায় যাবার প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থারও উদ্ভব হতে পারে যখন সাহায্যকারী জাহাজও বিক্ষুব্ধ অবস্থার মুখোমুখি। তখন অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। সে ক্ষেত্রে ওই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে এমন কোন জলযান পাঠানো হয়। কিংবা পাঠানো হয় হেলিকপ্টার বা সীপ্লেন। এমনও এক একটা দুঃসময় আসে যখন প্রায় একইসময় ডজন দুই জাহাজের বিপদের সংবাদ উপকূলে এসে হাজির হয়।

প্রতিকূল অবস্থায় অপরিসীম ঝুঁকি নিয়েও উদ্ধারের কাজ করতে হয়। দিনক্ষণ দেখে বিপদ আসে না। দিনের আলোয় তবু কিছু



প্লেট নম্বর 4.3 ঃ সাগরজলে উদ্ধারকাজে নিযুক্ত হেলিকপ্টার

বাড়তি সুযোগ থাকে, কিন্তু রাতের আঁধারে যখন উদ্ধার কাজ চালাতে হয় তখন তো সাহায্যকারীরকেও জীবনের প্রচন্ড ঝুঁকি নিতে হয়। হেলিকপ্টারের পাইলটের সামান্য অনবধানতায় যদি কোনক্রমে তার ব্লেড জাহাজের মাস্তুল স্পর্শ করে, তখন তার অবশ্য পরিণতি এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং সে বায়ুযানের সকলের অবধারিত মৃত্যু। এইসব ত্রাণকাজে জাহাজকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করতে হয় এবং কয়েকটা চক্রের পর পাইলটের মাথা ঘোরার এক প্রবল প্রবণতা দেখা দেয়।

মাঝসমুদ্রে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে যে জাহাজে ডাক্তার আছে তাঁকে রোগের উপসর্গ জানানো হয়। বেসরকারী চিকিৎসা সংস্থার জাহাজ থেকেও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। রোগের বিবরণ অনুযায়ী রোগনির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। সেই অনুসারে ওষুধপথ্যাদির উপদেশ দেওয়া হয়। সে ওষুধ অবশ্য জাহাজে পাওয়া চাই। অন্যথায় রোগীকে তীরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অবশ্য রোগী না দেখে রোগনিরূপণে চিকিৎসা বিভ্রাটের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। একবার এক নাবিকের উপসর্গ অনুযায়ী ডাক্তার মনে করলেন তার ফুসকুড়িযুক্ত এক জাতীয় কঠিন সংক্রামক ব্যাধি

হয়েছে। অবিলম্বে সীপ্লেন ছুটল তাকে তীরে নিয়ে আসার জন্য। যেহেতু অসুখটা সংক্রামক, তাই প্লেনের যে দুজন পরিচারক রোগীর সেবায় নিযুক্ত ছিল, তাদের তীরে অবতরণের পর সঙ্গরোধ করে রাখা হল পুরো দুটো দিন। সঠিকভাবে যখন রোগ ধরা পড়ল তখন জানা গেল নাবিকের সিফিলিস্ একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। অর্থাৎ এ রোগের জন্য তার পরিচারকদের সঙ্গরোধ করার কোন মানে হয় না।

তীরে খবর এসে পৌছাল একটি তলোয়ার মাছের দ্বারা এক জেলে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুশ্রূষার জন্য তাকে তীরে নিয়ে আসা প্রয়োজন। অনতিবিলম্বে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে সীপ্লেন উড়ে চলল ঘটনাস্থলের দিকে। যথাসময়ে রোগীকে প্লেনে তোলা হল। ডাক্তার রোগীকে পর্যবেক্ষণ শুরু করল। রোগীর জ্ঞান টন্‌টনে, কিন্তু যন্ত্রণায় বেশ কষ্ট পাচ্ছিল। পরীক্ষান্তে ডাক্তার মন্তব্য করল "ভাগ্যিস্ তলোয়ার মাছের তলোয়ারের ডগাটা ভোঁতা!" এই মাছের তলোয়ারের সামনেটা বৃত্তাকার, সাধারণতঃ 25 মিলিমিটারের মত ব্যাসার্ধ। ওই ডগাটা জেলের পেট থেকে আঁচড় কেটে পিঠের দিকে চলে গিয়ে মেরুদণ্ডের আধ ইঞ্চি দূরে এসে থেমেছে। তলোয়ার একান্ত ভোঁতা বলে চামড়া ভেদ করে শরীরের ভেতর কোন অঙ্গকে স্পর্শ করতে পারেনি। যদি তা ঘটে যেত, তবে জেলের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটলে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। জেলের কাছে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে সে বলল, "আমি তাকে সবে বড়শিতে গেঁথেছি, এমন সময় মনে হল সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। উত্তেজনায় ছিপটা ঠিক করতে গিয়ে আমি নৌকা থেকে পড়ে গেলাম। আর মাছটা যে দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে ঠিক সেইদিকেই। ও বোধ হয় আমার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছিল।"

মানুষের কৃতঘ্নতার পরিচয় পেয়ে একবার জনৈক ডাক্তারের মন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্র তীর থেকে অনেক দূরে এক জেলেকে সাহায্যের জন্য সীপ্লেন করে ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছিল সেই ডাক্তার। জেলের চোখে বড়শি গেঁথে গিয়েছিল। জেলের কাছে পৌছে দেখা গেল এক সহৃদয় বন্ধু বড়শির সঙ্গে জেলের চোখ উপড়ে নিয়েছে! রোগীকে ভাল করে দেখা হল, চোখে ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি যা করণীয় তা করা হল এবং সীপ্লেন তীরের দিকে যাত্রা শুরু করল। এয়ারপোর্টে জেলের স্ত্রী অতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। স্বামীর প্রত্যাবর্তনে তিনি কৃতজ্ঞতায় ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরলেন। প্লেনের পাইলটকে ধন্যবাদের জোয়ারে ভাসিয়ে দিলেন। এই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার এখানেই যবনিকা টেনে দেওয়া যেত। কিন্তু তা করা গেল না, তার কারণ, এর বছর

খানেক পরে ওই ডাক্তারের কাছে আদালত থেকে শমন এল যে এক জেলের চক্ষুকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ডাক্তার বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। মানুষের মন যে এত নীচ সে পরিচয় তাঁর আগে জানা ছিল না। উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বিপদ থেকে জেলেকে উদ্ধার করার জন্য এই পুরস্কার! অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত মানব-জীবন সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। মনের দুঃখে তিনি হাজির হলেন প্লেনের সেই পাইলটের কাছে। নিজের দুঃখের কথা অকপটে পাইলটকে বলে গেলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে পাইলট হেসেই খুন। আর ডাক্তারের ততই অবাক আর বিরক্ত হবার পালা। কোনরকমে হাসি থামিয়ে পাইলট অবশেষে জানাল যে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, আঘাতের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য এটা একটা বাঁধাধরা আইনগত পন্থা। এ মামলা ডাক্তারের উপর অনাস্থাজ্ঞাপক কিছু নয়।

সমুদ্রে উদ্ধারের কাজও অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের কিভাবে মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তার একটা ঘটনার উল্লেখ করি। সমুদ্রের তীর থেকে 80 মাইল ভেতরে এক জাহাজ থেকে অচৈতন্য রোগীকে নিয়ে আসার জন্য হেলিকপ্টার পাঠানো হল। হেলিকপ্টার যথাস্থানে এসে উত্তোলকের তলায় শয্যার উপাদান যুক্ত করে জাহাজের উপর নামিয়ে দিল। রেডিও মারফৎ কি করতে হবে তা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে দেওয়া হল। জাহাজের নাবিকরা শয্যাটা খুলে রোগীকে শুইয়ে দিল বটে কিন্তু তাকে শয্যার সঙ্গে বেঁধে দিল না। এই অবস্থায় উত্তোলকের সাহায্যে শয্যাটা ওঠানো মানে সেটা যদি সামান্য কাত হয়ে যায় তবে রোগীর নিম্নে পতন অনিবার্য।

রেডিওতে জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের আবার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু কাউকেই তখন পাওয়া গেল না। বোধ হয় সবাই জাহাজের পাটাতনে উপস্থিত হয়েছে উদ্ধারকার্য দেখবার অভিপ্রায়ে। হেলিকপ্টার থেকে বিভিন্নভাবে অঙ্গভঙ্গি করে এ ব্যাপারে সচেতন করার প্রচেষ্টা চলল, কিন্তু কিছুতেই তাদের ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত করা গেল না। যখন সবরকমের চেষ্টাই বিফলে গেল, তখন ভগবানের নাম করে শয্যাসহ রোগীকে উপরে ওঠানোপর্ব শুরু হল। সৌভাগ্যবশতঃ কোন ট্রাজেডি সেদিন ঘটেনি, বিরাট আশংকা থাকলেও খারাপ কিছু ঘটে গেলে সমস্ত দোষই হেলিকপ্টারের পাইলট আর তার সহকর্মীদের উপর বর্তাতো। তাই সমুদ্রে বিপদ থেকে ত্রাণের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের নায়ক হওয়া ও নিন্দার ভাগী হবার মধ্যে রেখার ব্যবধান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

সমুদ্রে মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে কিভাবে যে

নিজের বিপদ উপস্থিত হয় তার একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করব। এ সব ব্যাপারে যাঁরা খবরাখবর রাখেন, তাঁদের হয়ত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটার কথা মনে আছে। পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে অ্যাঙ্গাম্ বোটরাইট মাছ ধরার জন্য তাঁর 38 ফুট লম্বা নৌকা নিয়ে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপের কাছে এসে উপস্থিত। দ্বীপটা অত্যন্ত ছোট, এমনিতে পরিত্যক্ত। একটা লাইটহাউস ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। তবে এই ধরনের দ্বীপ চোরাকারবারীদের স্বর্গ। 1959 খৃষ্টাব্দ থেকে এখানে কিউবার কিছু বন্দুক চোরাকারবারীর লেনদেনের আদর্শ জায়গা ছিল। বোটরাইট নৌকা থেকে বাইনাকুলার লাগিয়ে দ্বীপটাকে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হল দ্বীপের উপর দাঁড়িয়ে তিনটে লোক তাঁদের দিকে প্রচণ্ডভাবে হাত নাড়ছে। আবার বাইনাকুলার চোখে দিলেন—দেখার কোন ভুল হচ্ছে না তো! দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা দিয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ম করলেন বোটরাইট। না, তাঁর দেখার কিছু ভুল নেই।

এ মুহূর্তে কি করা কর্তব্য তা ঠিক করতে ওরা কিছু সময় নিল। যত চিটিংবাজ, বদমাশ লোকের আড্ডা এই দ্বীপে। যদিও তারা দলে ভারী, তবুও ওই তিনটে লোকের কি উদ্দেশ্য বলা মুশকিল। তীরের কাছে একটা ভাঙা নৌকা অবশ্য দেখা যাচ্ছে। উপকূলরক্ষীবাহিনীতে চাকরি করে বোটরাইট। আপাততঃ তিনি সঙ্গীসাথী নিয়ে মাছ ধরতে বেড়িয়েছেন। অবসর বিনোদনেও বিপদের ইঙ্গিত! তবু কর্তব্য হিসেবে ওয়ারলেশ মারফৎ উপকূলরক্ষীবাহিনীকে খবরটা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নৌকা নিয়ে দ্বীপের দিকে এগোতে লাগলেন। কিছুটা এগিয়েই তিনি দেখতে পেলেন ওই তিনজন লোকের মধ্যে দুজন পুরুষ, আর তৃতীয়জন লাল চুলের অধিকারিণী অতি সুন্দরী এক তরুণী।

নৌকাকে তীরের দিকে আসতে দেখে ওদের একজন জামা খুলে সাঁতার কেটে নৌকার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর নৌকার কাছে এসে তাকে সেখানে তুলে নিতে সে বারবার অনুরোধ করতে লাগল। বোটরাইট প্রথমে কথা বলতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু লোকটা ক্রমাগত মিনতি করে চলল। নৌকা ভেঙে যাবার জন্য গত তিনদিন ধরে তারা দ্বীপে পড়ে আছে। সে তার দুরবস্থা জানিয়ে বাড়িতে একটা বার্তা পাঠাতে চায়। নৌকার রেডিওর মাধ্যমে এই সংবাদ প্রেরণের ব্যয়ভার বহন করতেও সে প্রস্তুত।

বোটরাইট দ্বিধায় পড়লেন। সঙ্গত কারণ ছাড়া এরকম বিপদে সহায়তার হাত না বাড়িয়ে দেওয়া তো নাবিকের পেশাবিরুদ্ধ। দোটানায় পড়ে অবশেষে লোকটাকে নৌকায় নেওয়া হল। আর আশ্চর্য, নৌকায় উঠে লোকটার আচরণ সন্দেহজনক হয়ে উঠল। রেডিও মারফৎ তার বাড়িতে খবর পাঠানোর লক্ষণ দেখা গেল

না। বরং অচিরেই সে বোটরাইটের সঙ্গে তর্ক বাঁধিয়ে দিল। দাবি জানাল নৌকাটাকে তীরে ভেড়াতে হবে। বিপদ বুঝে সঙ্গীদের কানে কানে তাঁর বন্দুকটা আনতে বললেন বোটরাইট। কিন্তু ওই লোকটা আরও তৎপর। সে কালবিলম্ব না করে নিজের প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে রাখা রিভালবার থেকে গুলি ছুঁড়ল। একটা গুলি লাগল বোটরাইটের চোখে, একটা তার বুকে। অচৈতন্য হয়ে নৌকার পাটাতনে পড়ে গেলেন তিনি। ইতিমধ্যে দ্বীপে অবস্থিত অপর লোকটি সাঁতার কেটে নৌকার কাছে এসে পড়েছে।

প্রথম যে লোকটিকে বোটরাইট নৌকাতে তুলেছিলেন, তার নাম উইলিয়াম সীস। বয়স 24। সে কিন্তু সাধারণ লোক নয়। যুক্তরাষ্ট্রের চারটে রাজ্যে তাকে খুনের আসামী বলে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। বর্তমানে তার সঙ্গী ব্যাঙ্কের কেরাণী অ্যালভিন টেবল্। টেবলের সহায়তায় সে বেনামে ব্যাঙ্কের চেক ক্রমাগত ভাঙিয়ে যাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে তাদের ধরা পড়ার আশংকা। তাই দুজনে মিলে একটা নৌকা কিনেছিল। উদ্দেশ্য পালিয়ে যাওয়া তাদের এ যাত্রায় সাথী ছিল টেবলের 18 বছর বয়স্কা স্ত্রী বারবারা। হয়ত সফল তারা হত, কিন্তু নৌকা ভেঙে গিয়ে পলায়নযাত্রার আপাততঃ বিরতি। ভাগ্যিস্ নৌকাটা খাবারদাবারে পূর্ণ করে রেখেছিল, তাই এই তিনদিন তাদের উপবাস করতে হয়নি।

উপকূলরক্ষীবাহিনী যে কোন মুহূর্তে এসে হাজির হবে, এ খবর সীসের জানা হয়ে গিয়েছিল। আর তাদের আসার আগে সীসকে পালাতে হবে। বোটরাইটের বন্দুক ইতিমধ্যে টেবলের দখলে গেছে। রিভালবার ও বন্দুক দিয়ে ভয় দেখিয়ে বোটরাইটের সঙ্গীদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হল। মৃতপ্রায় বোটরাইটকে লাইফ জ্যাকেট পড়িয়ে জলে ফেলে দিল – কৃতজ্ঞতার ঋণ তারা এইভাবে পরিশোধ করল! তারপর মাছ ধরা নৌকাটা তীরের কাছে নিয়ে এল যাতে বারবারা উঠতে পারে। সবে একমাস হল তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এ কদিনেই সে স্বামীর স্বরূপ চিনে ফেলেছে। ওই নৌকায় উঠতে সে অস্বীকার করল। বারবারার সঙ্গে বোঝাপড়া করার মত যথেষ্ঠ সময় তাদের হাতে ছিল না, তাই দুই দুর্বৃত্তকে নিয়ে নৌকা ধেয়ে চলল দক্ষিণদিকে।

উপকূলরক্ষীবাহিনীর বিমান যখন দ্বীপে এসে হাজির হল ততক্ষণে অনেককিছু ঘটে গেছে। জলে বন্দী বোটরাইটের সাথীদের এক এক করে বিমানে তোলা হল। বারবারাও প্লেনে উঠল। এতক্ষণে মাছধরার নৌকাটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তবুও বিমান উড়ে চলল তাদের অন্বেষণে। বাহামা দ্বীপপুঞ্জ তখন ব্রিটেনের অধীনে ছিল, আর বিমানটার ওই এলাকার সীমা অতিক্রম করলে অন্য রাষ্ট্রের আকাশসীমা লঙ্ঘন করা হবে। এদিকে আবার রাতের

অন্ধকার নেমে এল । তাই পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না । ইত্যবসরে সীস ও টেবল্ কিউবার জলসীমায় ঢুকে পড়েছে ।

দুদিন পরে কিউবার জলপুলিশ ওই দুই দস্যুকে গ্রেপ্তার করে । তারপর তাদের বাহামা সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করা হয় । বিচারে দুজনেরই ফাঁসির হুকুম হয় । 1961 সালের 10ই মে দুজনের ফাঁসি হয়ে যায় ।

সমুদ্রকূলবর্তী সমস্ত সন্ধান ও উদ্ধার করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকে । এই 'হাই টেক' যুগেও সারা পৃথিবী জুড়ে জাহাজ নিখোঁজ হচ্ছে । যোগাযোগ ব্যবস্থার এত উন্নতি সত্ত্বেও 80 বছর আগের মত আজও জাহাজ নিরুদ্দিষ্ট হওয়াকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না । 1975 খৃষ্টাব্দের আগের 16 বছর দেখা গেছে প্রতি বছর গড়ে 5 থেকে 10 টা জাহাজ হারিয়ে গেছে । 1980 সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমুদ্রে প্রায় 400 লোকের হদিশ পাওয়া যায়নি । সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলে ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন বিপদের থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা বিজ্ঞানের আশীর্বাদে যে প্রগতির ইঙ্গিত বহন করছে তা প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই । তবুও উন্নতপন্থা অবলম্বন করে সব মানুষের সব সময় প্রাণরক্ষা করা সম্ভবপর নয় । তবে বিপদের এই সম্ভাবনার হার যে কমেছে এটাই আমাদের অগ্রগতির পরিচায়ক ।

৫

জাহাজে আগুন

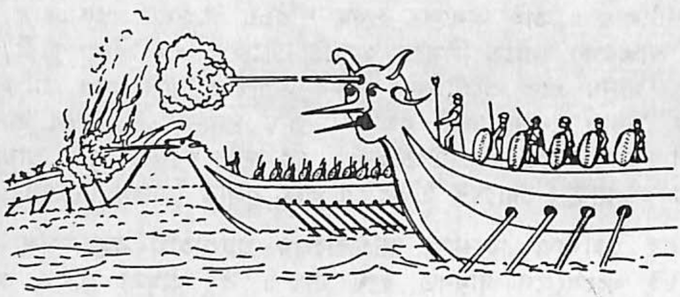
বিংশ শতাব্দীর বর্তমান স্তরে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মানুষের প্রথম মৌলিক আবিষ্কার হিসেবে যে জিনিষ নিঃসন্দেহে চিহ্নিত হতে পারে তা হল আগুন। আগুনের ব্যবহার শিখতে শিখতে সে অচিরেই উপলব্ধি করেছে তার বিধ্বংসীলীলার ক্ষমতাটিকেও। তাই অনলের প্রথম পরিচয় পাওয়ার পর তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখতে হয়েছে তাকে। এর বিনাশকারী রূপে সচকিত মানুষ এতে অলৌকিক শক্তির উপস্থিতি মনে করে তাকে তুষ্ট করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি। তার কল্পনায় অগ্নিদেব আরাধ্য দেবতা হিসেবে মূর্ত হয়ে উঠেছেন। এর ফলে দেখতে পাই আমাদের দেশের বা প্রাচীন রোমের ইতিহাসে তার পূজার বিভিন্ন নিদর্শন।

স্থলের কোথাও কোথাও অগ্নিকাণ্ডের প্রচণ্ডতায় বহু দুর্মূল্য দ্রব্য নিমেষেই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে যায়। বহু অমূল্য প্রাণও অত্যল্প সময়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। সর্বাধুনিক অগ্নিপ্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে সব কিছুই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। জাহাজে আগুন আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ মনে হতে পারে স্থলবাসীদের কাছে। কারণ স্থলে আগুন লাগলে জল জল করে হাহাকার পড়ে। কিন্তু সমুদ্রে তো আর জলের চিন্তা নেই, চারদিকেই জল, তুলে নিলেই হলো। কিন্তু ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়। কেননা অথৈ জলের মাঝখানে যখন আগুন লাগে, তখন মানুষের অসহায়তা যেন সমুদ্রের মত অতলস্পর্শী হয়ে যায়। স্থলের থেকে অনেক বেশি সমস্যা সেখানে উদ্ভূত হয়। অগ্নি নির্বাপণের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সর্বপ্রকার সুবিন্যস্ত বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও জাহাজে আগুন লাগলে সীমাহীন জলের মধ্যে আগুনের বিধ্বংসীলীলা নিরীক্ষণ করা ছাড়া অনেক সময়ই আর কিছু করার থাকে না। অথচ এই জলই আগুনকে মোকাবিলা করার প্রধান হাতিয়ার। আগুন সৃষ্টি হবার হাজার হাজার বছর পরেও তা নেভাবার একমাত্র অস্ত্র হল জল। বৈজ্ঞানিক পন্থায় অগ্নি নির্বাপণের প্রথম প্রচেষ্টা হয় হাতপাম্পের সাহায্যে। প্রায় দুহাজার বছর আগে রোমানরা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। তারপর বহু বছর ধরে এই যন্ত্রের মাধ্যমে অগ্নুৎপাতের বিভিন্ন পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা চলে। এমন কি 1666

খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল, তাকে সংযত করতে এই পাম্পগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

জাহাজে আগুন লাগে নেহাতই দুর্ঘটনা ক্রমে, নয়তো সুপরিকল্পিত ভাবে। আকস্মিকভাবে অগ্নিসংযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে অসাবধানতাবশতঃ। অতি সামান্য কারণে যে স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি, তা বিনা কালক্ষয়ে সমগ্র তরণী গ্রাস করে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে বিপুল সম্পত্তিহানির সঙ্গে বিনষ্ট হয় বহু জীবন। পরিকল্পনামাফিক পোতে আগুন লাগানো হয় যুদ্ধের সময়। এ ব্যাপারে যুগ যুগ ধরে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়েছে।

কয়েক শ' বছর আগে গ্রীকানলের নাম (চিত্র নং 5.1) শুনলে মুখ



চিত্র নং 5.1 ঃ গ্রীকানল

শুকিয়ে যেত না এমন সমুদ্রযাত্রী ছিল না বললেই হয়। বারুদের সম্ভাবনা জানার আগে এটাই ছিল জলযুদ্ধের মুখ্য অস্ত্র। বহুদিন ধরে এর ব্যবহার চলেছিল। এটা প্রয়োগ করার জন্য জাহাজকে বিশেষ আকৃতি দেওয়া হত। তার সামনেটা দেখতে ড্রাগনের মাথার মত। আর তা থেকে একজাতীয় তরল পদার্থ নির্গত হয়ে শত্রুর জাহাজে আঘাত করত। বাতাস স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তা দাউদাউ করে জ্বলে উঠত। আজ যেমন শত্রুর নিশানা লক্ষ্য করে দূর থেকে গোলাবারুদ নিক্ষেপ করা সম্ভব, তখন কিন্তু বৈরীতরীকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য তার নিকটে আগমন ছাড়া আর উপায়ান্তর ছিল না। এইভাবে ক্রমাগত ওই জলীয় পদার্থ নিক্ষেপ করা হত। গ্রীকানলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে জল দিয়ে একে নেবানো যেত না, বরং জলের স্পর্শে তা আরও দাউদাউ করে জ্বলত। একমাত্র শুকনো

বালি, ভিনিগার বা মূত্রের সহায়তায় একে নেভানো যেত। অনেক সময় চীনেমাটির বড় আধারে এই তরল পদার্থ রাখা থাকত। গ্রীকানল থেকে উদ্ভূত আগুন প্রচণ্ড ধোঁয়া উদ্গিরণ করত, গগনভেদী আওয়াজ তার সঙ্গবহ, আর এক প্রাণান্তকর দুর্গন্ধ তার সহচর। গ্রীকানল ব্যবহারের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সালামিসের যুদ্ধে। 480 খৃষ্টপূর্বে এই রণে পরস্পর বিরোধী দুটো দেশ ছিল পারস্য ও গ্রীস। 1190 খৃষ্টাব্দে পিসানরা এর উত্তম ব্যবহার জানত বলে তুর্কীদের নাস্তানাবুদ করতে পেরেছিল।

আর্কিমিডিসের প্রসিদ্ধি মূলত প্লবতা সূত্রের জন্য। তিনি তখনকার দিনে গ্রীস দেশের একজন শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। কারণে অকারণে রাজদরবারে তাঁর তলব পড়ত। সেই সময় রোমানদের সারি সারি জাহাজ সাইরাকুস আক্রমণের অভিপ্রায়ে গ্রীস উপকূলে হাজির হয়। চারিদিকে সাগর পরিবেষ্টিত গ্রীসকে অধিগ্রহণ করা জল পথেই প্রশস্ত বলে তারা মনে করেছিল। গ্রীসের এই আসন্ন বিপদে অর্কিমিডিসের ডাক পড়ল। দেশকে রক্ষা করার উপায় নির্দেশনায় তাঁর অভিমত তখন অত্যন্ত মূল্যবান।

শত্রুজাহাজ ধ্বংসের একটা সহজ উপায় উদ্ভাবন করে ফেললেন আর্কিমিডিস। সূর্য রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে একটা ধাতুর আয়নার সহায়তায় তা ফলিত করতে লাগলেন শত্রু জাহাজের উপরে। আর অল্পক্ষণ পরপরই রোমানদের রণতরীগুলো জ্বলে উঠতে লাগল! প্রবল পরাক্রান্ত রোমানরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। তাদের সেনাদের বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা গেল। তীর নয়,বারুদ নয়, কোনরকমের যুদ্ধ করার সরঞ্জাম নয়, যেন এক অদৃশ্য শক্তি মন্ত্র উচ্চারণে কাজ হাসিল করে চলেছে। বিশাল রণসম্ভারে সজ্জিত রোমানদের সঙ্গে গ্রীকেরা শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি, কিন্তু এই যুদ্ধে বিজেতার প্রচুর ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। তাই গ্রীসের উপকূলে নেমে ক্ষতির আক্রোশে তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তীরে নেমে প্রথমেই অনুসন্ধান করতে থাকে সেই 'ভয়ঙ্কর জাদুকরের'। বৃদ্ধ মনিষীর সন্ধান পাওয়া মাত্রই তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। অভিনবভাবে জাহাজে অগ্নিসংযোগের উপায় উদ্ভাবনের জন্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে সেদিন প্রাণবলি দিতে হয়েছিল।

মধ্যযুগে শত্রুজাহাজ ধ্বংস করার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করা হত তাদের মধ্যে ছিল নিজেদের জাহাজে আগুন লাগিয়ে তা বিপক্ষের রণতরীর অবস্থানের ভেতর স্থাপনের চেষ্টা করা। জ্বলন্ত জাহাজে বিস্ফোরক মজুত থাকত। বাতাসের গতি, ঢেউ ও স্রোতের বেগ হিসেব করে তা এমনভাবে ছাড়া হত যাতে শত্রুর মুখোমুখি এসে বিস্ফোরণ ঘটত। অবশ্য জ্বলন্ত জাহাজকে যাত্রাপথের অনেকটাই অন্য আর একটা জাহাজের সাহায্যে টেনে নিয়ে যেতে

হত। তবে বহুক্ষেত্রেই দেখা যেত যে দুটো জাহাজেই আগুন লেগে গেছে।

ইউরোপের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় যে সারা মধ্যযুগে সেখানকার বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। স্থলপথে, জলপথে সর্বক্ষণই কোথাও না কোথাও যুদ্ধ লেগেই থাকত। এইরকম কোন এক সময় ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে স্পেনের ঘোরতর রেষারেষি চলছিল। তখন আসন্ন রণের আশংকায় দুই দেশই প্রহর গুনছিল। সেদিন আগুনকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পেরেছিল বলেই স্পেনের একটা সম্ভাব্য আক্রমণকে ইংল্যাণ্ড পর্যুদস্ত করেছিল। সালটা ছিল 1588। স্পেনের যুদ্ধজাহাজগুলো নোঙর করা ছিল ক্যালিয়াস্ রোডস্ বন্দরে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জাহাজের বহর তখন স্পেনের দখলে – সংখ্যায় সেটা 136। পরিকল্পনা ছিল পার্মারের (বর্তমান ইতালীর এক রাজ্য) 30000 সৈন্য ও তাদের ছোট জাহাজগুলি সহযোগে স্পেন ইংল্যাণ্ড আক্রমণের অভিপ্রায়ে টেমসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। স্পেনের ওই আক্রমণের কথা গুপ্তচর মারফৎ ইংল্যাণ্ড জেনে যায়। স্পেনের এই সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলা করার প্রশ্ন তাই অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠল। ইংল্যাণ্ডের নৌসেনাপতিরা আলোচনায় বসলেন। নৌঅধ্যক্ষ উইলিয়াম উইন্টারের সঙ্গে লর্ড টমাস হাওয়ার্ডের বৈঠক হল এবং বহু চিন্তাভাবনা করে আক্রমণ প্রতিহত করার খসড়া তৈরী হল। তারা অনুধাবন করল যে বিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া রক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায়।

স্পেনের যুদ্ধজাহাজগুলো যেখানে নোঙর করা ছিল, সেখানে অগ্নিজাহাজ পাঠাবার প্রস্তাব রাখা হল। সেই অনুযায়ী ৪0 টা পুরনো জাহাজে আগুন লাগিয়ে নির্দিষ্ট পথে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর শত্রুপক্ষের জাহাজের কিছু আগে হাওয়া ও জোয়ারের ভরসায় ভেসে যাবার অপেক্ষায় রেখে দেওয়া হল। অগ্নিজাহাজগুলোকে আসতে দেখে বন্দরে স্থিত স্পেনের জাহাজগুলো নোঙর ছিঁড়ে যে যেদিকে পারল মরিয়া হয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। আগুনের স্পর্শে কিছু কিছু বিস্ফোরণ ঘটল বটে, কিন্তু তাতে স্পেনের ডুবোজাহাজগুলোর বিশেষ কোন ক্ষতি হল না। কিন্তু বন্দরের সুরক্ষিত অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসাই তাদের কাল হল। ইংল্যাণ্ডের রণতরীগুলো এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। এইরকম একটা সম্ভাবনা আন্দাজ করে তারা বন্দরের বিভিন্ন দিকে প্রস্তুত হয়েই ছিল। সুযোগ বুঝে স্পেনের দিশাহারা নৌসেনাদের ওপর হিংস্র ব্যাঘ্রের মত তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিরাপদ নোঙরের আশ্রয় থেকে খুবই অল্প কয়েকটা জাহাজ সেদিন স্বদেশে ফিরতে পেরেছিল।

বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে কত জাহাজের যে ক্ষতি হয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। 1770 সালে বেঙ্গল নামে এক জাহাজ গঙ্গার মুখে থাকাকালীন বিদ্যুতের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সেই জাহাজের 360 যাত্রীর অর্ধেকের বেশিরই তৎক্ষণাৎ তড়িৎপ্রবাহে মৃত্যু ঘটে। অগ্নিদগ্ধ বেশ কিছু যাত্রী আগুন দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কালক্ষেপ না করে গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যারা সাঁতার জানত না তারা অচিরেই গঙ্গার স্নিগ্ধ জলে সমাহিত হয়। আর অল্প যে কজন সেদিন তীরে এসে পৌঁছতে পেরেছিল, তাদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল সুন্দরবনের বাঘের পাকস্থলীতে।

আজ জাহাজে অগ্নির্নিবাপণের উপায় অনেক উন্নত। অল্পস্বল্প আগুন দেখা দিলে আতঙ্কিত হবার সমুচিত কারণ কিছু থাকে না। তবে আশ্চর্য হবার কথা এই যে আগের চেয়ে আজকাল জাহাজে অনেক বেশী আগুন লাগে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় 1924 সালে যেখানে সারা পৃথিবীতে মাত্র তিনটে জাহাজে আগুন লেগেছিল, সেখানে 1977 সালে 46 টা জাহাজ অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। তাই অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিসংযোগের সম্ভাবনাগুলোর উপর সমান নজর দেওয়া উচিৎ।

অনেক বিবর্তনের পর ল্যাকোনিয়া গ্রীক যাত্রীবাহী জাহাজ হিসেবে সমুদ্রে ভেসে চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এটা হল্যাণ্ডের



চিত্র নং 5.2 : সাগরপোতে আগুন

একটা প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছিল। তখন সে হল্যাণ্ড ও তার তখনকার উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সৈন্য পারাপার করত। পঞ্চাশের দশকে সে অস্ট্রেলিয়ায় দেশান্তরীদের নিয়ে যেত। 1959 সালে আরো পরির্বতন সাধন করে তাতে 1210 জন যাত্রীর সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। তারপরই এক গ্রীকবণিক এই জাহাজটা কিনে নেন এবং এর নতুন নামকরণ হয় ল্যাকোনিয়া।

জাহাজের এই পরির্বতনের ফলে অনেক ছোটখাট দোষত্রুটি থেকে গিয়েছিল। মালিক তা সংশোধনে অপারগ ছিলেন। তার এহ নিস্পৃহতার ফলে অতিরিক্ত কম্পন বা ঘড়্ঘড়্ শব্দ যাত্রীদের বিরক্তি উৎপাদন করত। কিন্তু এইসব গলদ সত্ত্বেও সে যাত্রায় সব যাত্রীই খেয়ালখুশী উপছে পড়া মেজাজ। কারণ, আর মাত্র কটা দিন পরই বড়দিন। যাত্রীরা প্রায় সবাই ব্রিটেনের অধিবাসী, আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই আবার বৃদ্ধবৃদ্ধা। প্রায় সকলেরই এই প্রথম সমুদ্রযাত্রা। নাবিকরা ইডরোপের বিভিন্ন দেশের নাগরিক – ইতালী, সাইপ্রাস, ব্রিটেন, গ্রীস ও জার্মানীর।

দিনটা ছিল 22শে ডিসেম্বর। খুশীর ফোয়ারা ছুটছে চারিদিকে। জাহাজের আরামকক্ষে বসে বেশ কিছু যাত্রী সিনেমা দেখছে। অনেকেই তখন মদ্যপানাগারে বসে। পাঁচটা পানকক্ষই পরিপূর্ণ। হৈ-হুল্লোড় ফূর্তিতে জাহাজ টইটম্বুর। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। কারুরই কোন কিছুতে পরোয়া নেই। সবাই ভাবছে এর চেয়ে ভালভাবে বুঝি আর সময় কাটানো যায় না।

রাত তখন 10.50। জাহাজের ক্যাপ্টেন ম্যাথিওস জাব্রিস বুঝতে পারলেন জাহাজে আগুন লেগেছে। তিনি দেখতে পেলেন যে সিঁড়ি থেকে চাপ চাপ ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, আর তা নৃত্যকক্ষে প্রবেশ করছে। তার মিনিট কয়েক আগে যাত্রীরা দুজন নাবিককে নিচে নেমে যেতে দেখেছে জাহাজের অন্য ডেকে। ধোঁয়া প্রথম নজরে পরে ওই দুই তরুণের। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লাগার সতর্ক ঘন্টা বাজানোর কথা না চিন্তা করে তারা নিজেরাই তা নেবাতে উদ্যোগী হল। আগুন বোজার হাতিয়ার তাদের হাতে যা ছিল আগুনের প্রচণ্ডতার তুলনায় তা যৎসামান্য। অনেকগুলো ভুল সে রাতে পরপর ঘটে গিয়েছিল, এটা তার মধ্যে প্রথম। আগুনের ব্যাপার অবহিত হওয়াতে জাব্রিস প্রথমেই রেডিও অফিসারকে নির্দেশ দিলেন যে জাহাজের বিপজ্জনক পরিস্থিতির খবর জানিয়ে চারিদিকে এস্ ও এস্ পাঠিয়ে দেবার জন্য।

তারপর তিনি সমস্ত যাত্রীকে রেস্তোরাঁতে জড় হতে আদেশ দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেককে এক একটা করে লাইফ জ্যাকেট দেওয়া। সকলে তখন চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। পানাগার, আরামকক্ষ, নৃত্যকক্ষ যে ডেকে অবস্থিত রেস্তোরাঁ তার থেকে তিন

ডেক নিচে। এতগুলো লোকের নিচে নামার সিঁড়ি একটাই। ওই আশঙ্কাজনক মুহূর্তে যাত্রীদের ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সৌভাগ্যবশতঃ অনেকেই নিচে নামতে অস্বীকার করল, তাই সিঁড়ির উপর বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জটলাজটলি করে বিপদ বাড়ানো আপাততঃ এড়ানো গেল।

আগুন ক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে লাগল। পুরো জাহাজটা ভস্মীভূত হওয়া শুধুমাত্র সময়েরই প্রতীক্ষা। এই কঠিন সত্যটা জাব্রিস সহজেই অনুধাবন করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লাইফবোট নামাতে আদেশ দিলেন। 24 টা লাইফবোট জাহাজে মজুত ছিল। তাতে যত যাত্রীকে স্থান দেওয়া যেত, তত যাত্রী কিন্তু জাহাজে ছিল না। সমুদ্রও সে রাতে ছিল ধ্রুবতারার মত স্থির। ততক্ষণে ল্যাকোনিয়ার বিপদের কথা অনেকে জেনে গেছে। তাই কাছাকাছি যে সব জাহাজ ছিল তারা তার কাছে আসতে শুরু করেছে। যাত্রীদের প্রাণরক্ষা করার যথেষ্ঠ ব্যবস্থা ও সময় তখন হাতে ছিল। তাছাড়া সমস্ত পরিবেশই যথেষ্ঠ অনুকূল ছিল। কঠিন বিপদের মুখে অনেক সহজ কাজও কঠিন হয়ে যায়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে কাজ মসৃণ ও সুষ্ঠুভাবে হবার কথা বিপদের মুহূর্তে তা করতে ভুলের অঙ্ক ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। সে সময় জাহাজের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ অফিসার আগুনকে কোনরকমে নেভাবার শেষ চেষ্টা করতে লাগল। কারুরই খেয়াল হল না যে লাইফবোট জলে নামাবার সময় তাদের অন্ততঃ অল্প কয়েকজনের এ কাজ পরিচালনা করা একান্ত দরকার ছিল। দুজন আনাড়ি নাবিক যাত্রীদের লাইফবোটে আরোহণ ও তা জলে অবতরণ পরিচালনা করতে লাগল। তার উপর ওই ব্রাহ্মমুহূর্তে জাহাজে ঘোষণা করার মাইকও খারাপ হয়ে গেল। সমস্ত লাইফবোটের তদারকির ব্যাপারটাই ঘটে চলতে লাগল চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে। লাইফবোট নামাবার গিয়ারগুলো আবার ঠিকমত তেল দিয়ে মসৃণ করে রাখা হয়নি। তাই জাহাজের রঙ লেগে তা বারবার আটকে যাচ্ছিল। অনভিজ্ঞ নাবিকদের পরিচালনায় দুয়েকটা দুর্ঘটনাও ঘটে গেল।

আগুন যত এগিয়ে আসতে লাগল, যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ততই বেড়ে চলল। একটা লাইফবোট সমুদ্র স্পর্শ করার সঙ্গেসঙ্গেই উল্টে গিয়ে যাত্রীদের সাগরজলে ফেলে দিল। একটা আবার এত জোরে সাগরের বুকে নেমে এল যে প্রায় নিমেষেই সে জলধির অতলে তলিয়ে গেল। এসবের ফলে ভাসন্ত ও ডুবন্ত যাত্রীদের আর্তনাদ একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। এই সঙ্কটমুহূর্তে বৃটিশ যাত্রীরা 'নারী ও শিশু আগে' এই প্রাচীন রীতিতে বিশ্বাসী হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়ে গেল। যেখানে আসনের কোন অভাব ছিল না, সেখানে মহিলা ও শিশুদের অগ্রাধিকার না দিয়ে যদি এক একটা পরিবারকে

নামিয়ে দেওয়া হত, তাহলে আরও বেশি লোকের প্রাণ যে বাঁচত তাতে কোন সন্দেহ নেই। 17 টা লাইফবোট সাফল্যের সঙ্গে নামানো গেলেও তাতে অনেক আসনই শূন্য পড়েছিল।

এখন আগুন এসে শেষ লাইফবোট স্পর্শ করল, তখনও বোটডেকে বহু যাত্রী ও নাবিক দাঁড়িয়ে। লাইফজ্যাকেট পরে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়া বা ভাঙা তক্তায় ভেসে থাকা ছাড়া তখন আর তাদের কোন পথ খোলা ছিল না।ইতিমধ্যে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে উড়োজাহাজ ল্যাকোনিয়ার চারপাশে পরিক্রমা করতে শুরু করেছে। আর্জেন্টিনার জাহাজ মান্টা, ব্রিটেনের মান্টক্যাম, যুক্তরাষ্ট্রের রিও গ্রাণ্ড ও পাকিস্তানের মেহেদী তার অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে। লাইফবোট থেকে এক একটা করে যাত্রীকে ওইসব জাহাজে উত্তোলন পর্ব শুরু হল। উদ্ধারের শেষে দেখা গেল 95 জন যাত্রী ও 33 জন নাবিক নিখোঁজ হয়েছে। এই 128 জন যাত্রীর কেউ কেউ আগুনে নিজেকে আহূতি দিয়েছিল। তবে অধিকাংশই সাগরের ঘন নীল জলে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

এই অগ্নিকাণ্ডের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধানের পর জাব্রিস ও তার সহকর্মীদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। জাহাজে আগুন নেবাবার সব রকম সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও দক্ষতার অভাবে জাহাজের সুবিশাল ক্ষতি ও অহেতুক প্রাণহানি হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে ঘটনার সম্যক ও সঠিক চিত্র অনেক সময়ই স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে না। তবু বিভিন্ন তথ্য উদ্ঘাটনে কিছু কিছু দোষত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায় বই কি! তাই জাব্রিসকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল। জাব্রিস হয়ত বলতে পারতেন বন্দরে জাহাজ বিনষ্ট হবার ভুরি ভুরি ঘটনা বর্তমান। সেখানে তো অনেক সুদক্ষ কর্মী মজুত থাকে। আগুন মোকাবিলা করার সবরকম সুযোগই তো সেখানে বিরাজ করে। তবু মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুরো জাহাজ ভস্মীভূত হবার ঘটনা খুব বিরল নয়। তাই তো ভাবি, কয়েক শ বছর আগে আগুনলাগাকে মানুষ যত ভয় করত, বিজ্ঞানের এই শত যোজন অগ্রগতির পরও আজ কি আমাদের ভয় বিন্দুমাত্র কমেছে!

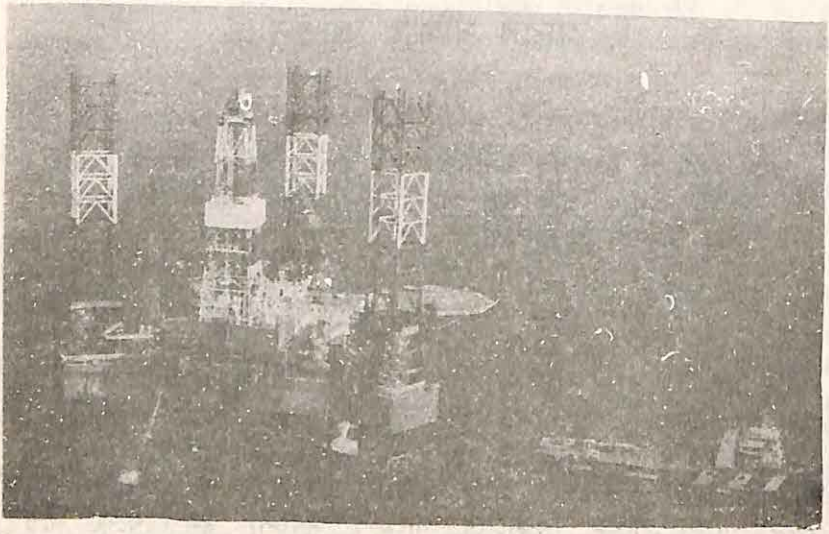
৬

আরব সাগরে আগুন

বম্বে হাই তে তৈলকূপ খননের কাজ হচ্ছিল সাগর বিকাশ থেকে। ব্লো-আউট অর্থাৎ প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের আকস্মিক নির্গমনে সেই সাগর বিকাশে আগুন লাগে। 1982 সালের ২রা আগস্ট সকাল 6.15 মিনিটে আগুন দেখা গেল। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল আগুন। গত দুদিন ধরে যেটা ছিল আশংকা, এখন তা সত্য হতে চলল। 80 মিটারের উপর বিরাট ইস্পাতের কাঠামোটা বুঝি যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ে। পাশেই বম্বে হাইয়ের দক্ষিণাংশের এস জে 5 প্লাটফর্ম। আগুনের হাত থেকে তাও রেহাই পেল না। বিশেষভাবে আগুন নেভাতে সক্ষম প্যাসিফিক কনস্টাকটার ও গল্ফ ফ্লিট, জলযান দুটি থেকে প্রতি মিনিটে 26000 গ্যালন জল নিক্ষিপ্ত হতে লাগল সাগর বিকাশের গায়ে। দুর্ঘটনা স্থল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সাগর প্রগতি দাঁড়িয়ে। বম্বে হাইয়ের দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম বম্বে হাই উত্তর ও বম্বে হাই দক্ষিণ মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল।

চারিদিকে জল, অপর্যাপ্ত জল, অফুরন্ত জল। সবকিছুকে উপেক্ষা করে আগুন জ্বলতে লাগল। 6 থেকে 8 ফুট তার ব্যাস আর সাগরের জলের স্তর থেকে উচ্চতা 80 ফুট। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সংগ্রাম চলল ঘন্টার পর ঘন্টা। অবশেষে 5 ই আগষ্ট আগুন নিভল, তখনও সাগর বিকাশ সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে, তবে বোঝা যাচ্ছে সেটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এস জে 15 প্লাটফর্মের অবস্থাও তথৈবচ। আশংকা রয়েই গেল – এ নেভা কি সাময়িক!

'সাগর বিকাশ' একটা জ্যাক-আপ রিগ্। 27 কোটি টাকা দামের এই বিশেষ ধরনের 'জাহাজ' জাপানী জাহাজ কারখানা 'হিটাচি সোসেন' – এ নির্মিত। সমুদ্রের তলে তেলকূপ খননের কাজ করতে হয় একটা পাটাতন থেকে। অনেক সময় পাটাতনের ভার একটি অবয়ব নেয় যেটা সমুদ্রতলে স্থিরীকৃত থাকে। অবয়ব সহ পুরো পাটাতনকে প্লাটফর্ম বা মঞ্চ বলে। কোন কোন পাটাতন সাগরের জলে ভাসমান হয়। প্রোথিত মঞ্চগুলো বানানো হয় তেল উৎপাদনের জন্য। কিন্তু অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত মঞ্চগুলি ভাসমান। এরা তিনরকমের হয় – জ্যাক-আপ রিগ্, অর্ধভাসমান



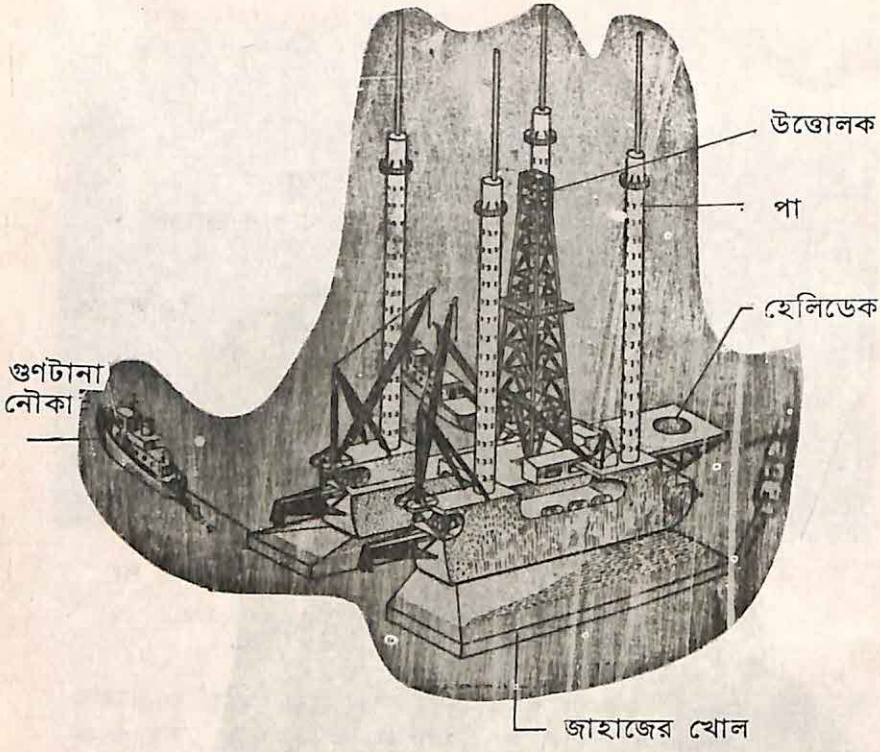
প্লেট নং 6.1 ঃ সাগরে প্রোথিত জ্যাক্ - আপ - রিগ

জাহাজ ও তৈল খনন জাহাজ। জ্যাক-আপ, পাটাতনে তেল খননের সমস্ত রকম উপকরণ ও সরঞ্জাম নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রওনা হয়। অধিকাংশ জ্যাক-আপ গুণটানা নৌকা টেনে নিয়ে যায়। নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়ে এদের পা নিচে নামিয়ে দেওয়া হয় সমুদ্রের তলে (চিত্র নং 6.1)। যানের পরিকল্পনা অনুসারে পাগুলো হয় সমুদ্রতলে পোঁতা থাকে, নয়ত তলকে শুধুমাত্র স্পর্শ করে থাকে। এবার জাহাজের খোলটা সমুদ্রের জলের ওপর থেকে শূন্যে তুলে নেওয়া হয়। পাটাতন এখন সমুদ্রের বুকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তেলকূপ খননের কাজ এবার শুরু হতে পারে। কাজ শেষ হয়ে গেলে পাগুলো তুলে নিয়ে জ্যাক-আপ ভেসে চলে।

তেল আহরণের জন্য মানুষ সমুদ্রের তীর থেকে ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করছে। গত চার দশক ধরে এ সংক্রান্ত সক্রিয়তা মূলত জলের 90 মিটার গভীরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর সাগরজলের 15 মিটার থেকে 90 মিটার গভীরতায় অনুসন্ধানের কাজে। তাই ওই তিন রকমের জলযানের মধ্যে জ্যাক্-আপ এখনও বেশী ব্যবহৃত হয়, যদিও সমুদ্রে খননের কাজ ধীরে ধীরে গভীর জলে অগ্রসর হচ্ছে এবং মেক্সিকো উপসাগরে একাধিক প্লাটফর্ম আছে যারা 300 মিটারের বেশি জলের গভীরতায় দাঁড়িয়ে। জ্যাক্-আপ সাগরতলের 2300 মিটার থেকে 7600 মিটার নিচে খননকার্য



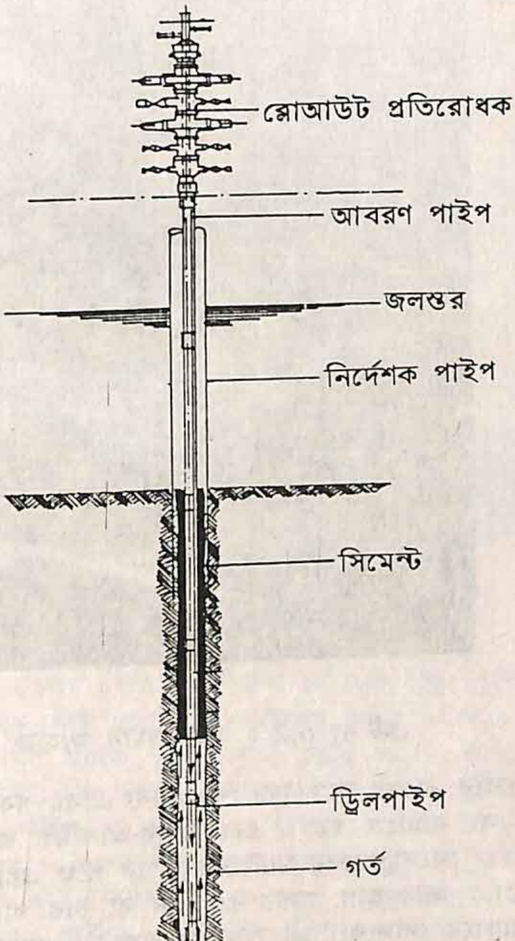
চিত্র নং 6.1 ঃ স্বাধীন পা-ওলা জ্যাক-আপ



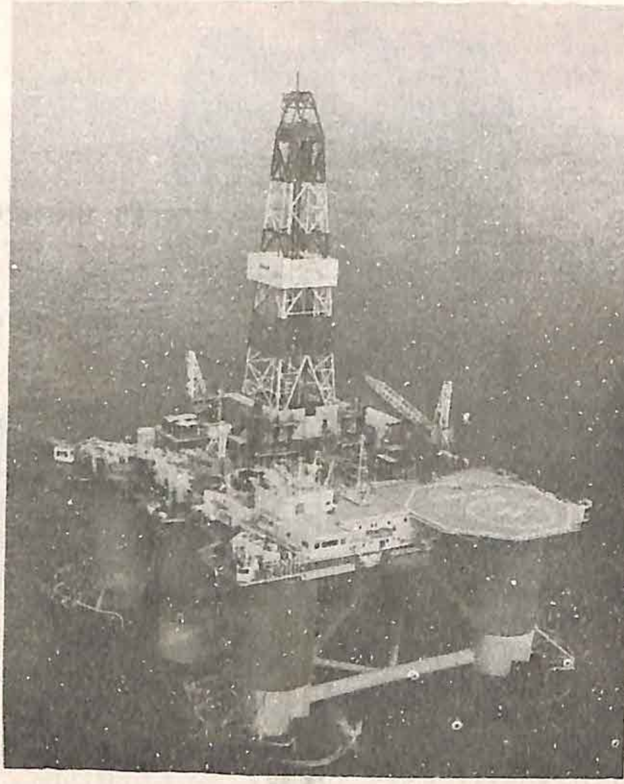
চিত্র নং 6.2 ঃ মাদুর আলম্বিত জ্যাক্ - আপ

চালাতে পারে। এই সীমারেখার মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা যে যথেষ্ঠ প্রসারিত তাতে সন্দেহ নেই।

দু ধরনের পা-ওলা জ্যাক-আপ দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে সমুদ্রতল উঁচু-নিচু বা ঢালু এবং তাঁর মাটি মোটামুটি ভাবে শক্ত, সেখানে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত পা-ওলা জ্যাক-আপ ব্যবহৃত হয়। (চিত্র নং 6.1)। এর প্রতিটি পা আলাদা আলাদাভাবে ওঠানো নামানো করা যায়। আর এক ধরনের জ্যাক-আপ আছে যার পা



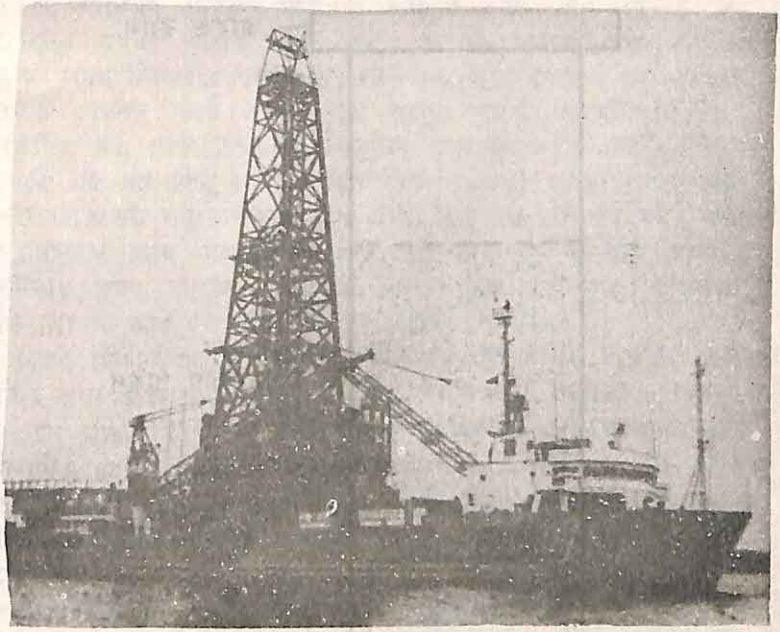
চিত্র নং 6.3 ঃ তেল খননের পদ্ধতি



প্লেট নং 6.2 ঃ অর্ধভাসমান জাহাজ

গুলো একটা বাক্সের সঙ্গে যুক্ত, যার জন্য এদের সবগুলিকে একসঙ্গে ওঠাতে বা নামাতে হয়। এরা মাদুর-আলম্বিত জ্যাক-আপ নামে অভিহিত। যে সমুদ্রতলের মাটি নরম তার পক্ষে এরা উপযুক্ত (চিত্র নং 6.2)। জ্যাক্-আপ সাধারণতঃ তিন বা চার পা-ওলা হয়। পা গুলি আকারে গোলাকার বা আয়তক্ষেত্রাকার। ভাবতে বেশ আশ্চর্য লাগে, একটা জাহাজ সাগরের বুকে ভেসে যাচ্ছে, তার পাশ দিয়ে আকাশের দিকে উঠে আছে তিন বা চারটে ইস্পাতের ভারী কাঠামো–জলস্তর থেকে 80 বা 90 মিটার উপরে।

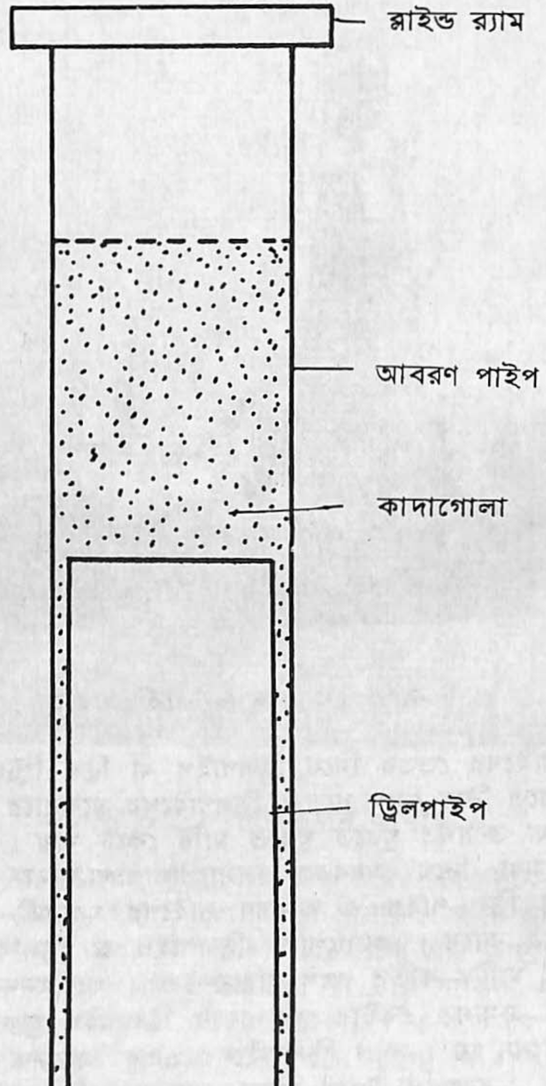
স্থলের তুলনায় সমুদ্রে তেলকূপ খননের কাজে সমস্যা অনেক বেশি। সেখানে কিভাবে এ কাজ সম্পাদন করা হয় তা 6.3 চিত্রে দেখান হয়েছে। প্রথমে প্লাটফর্ম থেকে একটা নির্দেশক পাইপ (conductor pipe) সমুদ্রতলের নিচে প্রবেশ করানো হয়। এর ভেতরে থাকে আবরণ পাইপ (Casing)। ভূস্তরের আর আবরণ পাইপের মধ্যবর্তী অংশটুকু সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই পাইপের মুখ্য উদ্দেশ্য খননের গর্তকে রক্ষা করা ও গর্ত থেকে নির্গত গ্যাস ও তেলের স্তর যাতে মিশে না যায় তা রোধ করা। এই



প্লেট নং 6.3 ঃ তৈলখননকারী জাহাজ

আবরণ পাইপের ভেতর দিয়ে ড্রিলপাইপ বা ড্রিল স্ট্রিং মাটি গর্ত করতে করতে নিচে নেমে চলে। ড্রিলপাইপের একেবারে নিচে থাকে ড্রিলবিট যা ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে মাটি কেটে যায়। ফাঁপা ড্রিল পাইপের মধ্য দিয়ে অনবরত কাদাগোলা পাঠানো হয়। এই কাদাগোলা ড্রিল পাইপ ও আবরণ পাইপের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে উপরে উঠে আসে। কাদাগোলা ড্রিলপাইপ ও ড্রিলবিট্‌কে ঠান্ডা রাখে এবং মাটির কর্তিত অংশ সরিয়ে দেয়। যত খননকার্য এগিয়ে চলে ততই ক্রমাগত একটার পর একটা ড্রিলপাইপ যুক্ত করে তার দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়। সমস্ত ড্রিলপাইপের ওজন উত্তোলক (derrick) বহন করে। সবচেয়ে উপরে থাকে তেল-গ্যাস নির্গমন প্রতিরোধক (blowout preventer বা BOP)। প্রাকৃতিক তেল বা গ্যাস নিজের চাপেই উপরে উঠে আসে। খননকালে চাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে অস্বাভাবিক আকার ধারণ করলে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করে এই প্রতিরোধক। সাগর বিকাশে ওইরকমই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

ব্লো-আউট মানে তেলকূপ থেকে উদ্‌যান ও অঙ্গারের মিশ্র



চিত্র নং 6.4 ঃ ড্রিলপাইপের একাংশ

পদার্থের (এখানে অশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের) প্রচন্ড চাপে হঠাৎ নির্গত হওয়া । এই বহিরাগমন মানেই কিন্তু আগুন লাগা নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্লো-আউটের কয়েকঘন্টার মধ্যে আগুন লেগে যায় — কর্তিত অংশ ও বালির সঙ্গে উচ্চচাপযুক্ত

গ্যাসের আবরণ পাইপে ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে এটা হয়। ব্লো-আউটের ব্যাপ্তি কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক সপ্তাহ হতে পারে। অনেক সময় নিজের থেকেই ব্লো-আউট বন্ধ হয়ে গেছে। তা না হলে অনেক মেহনত করে এদের বন্ধ করতে হয়। আমেরিকায় ব্লো-আউটের গড় প্রতি 250 টি সামুদ্রিক তেলকূপখননে একটি; উত্তর সাগরে এই গড় কিছু বেশি। সাগরবিকাশে যখন আগুন লাগে তখন পর্যন্ত ভারতের সমুদ্রোপকূলে প্রায় 200 টির মত তেলকূপ খনন করা হয়েছিল – তার মধ্যে সাগরবিকাশের ওই ব্লো-আউটই প্রথম। দুর্ঘটনার সময় সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চতা ছিল 15 ফুট, বাতাসের গতি 30 নট আর তাপমাত্রা ছিল 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

সাগর বিকাশ থেকে খননকালে কিভাবে ব্লো-আউট হয়েছিল তার সঠিক তথ্য উপস্থাপনা কারা বোধ হয় সম্ভব নয়। দুর্ঘটনার পরপরই ও. এন্. জি. সি. তদন্ত কমিশন বসিয়েছিলেন। তারা যথাসময়ে রিপোর্টও পেশ করেছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করা হয়নি। তাই যেটুকু বিবরণ জানা গেছে তা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণের মাধ্যমে। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন এ ব্যাপারে খুবই কম কথা বলেছেন।

27 শে জুলাই 1982 মাঝ রাতে সাগর বিকাশ থেকে ড্রিলাররা খনন কাজের সময় ড্রিলপাইপে এক অস্বাবিকভাবে বেশি চাপ অনুভব করল। এই অতিরিক্ত চাপের মোকাবিলা করতে কাদাগোলার ঘনত্ব প্রতি গ্যালনে 9.4 পাউন্ড থেকে 10 পাউন্ড করা হল। কিন্তু অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। এ অবস্থায় খননের কাজ বন্ধ রাখাই সমীচীন মনে করল খনন বিশারদেরা। আন্দাজ করা হল ড্রিলপাইপ অত্যন্ত চাপযুক্ত এলাকায় পড়েছে। খননের কাজ তখন চলছিল ভূস্তরের 1600 মিটার গভীরে। আবরণ পাইপের মুখটা ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা দরকার বলে ড্রিলপাইপটা খুলে আবরণ পাইপের ভেতর ফেলে দেওয়া হল। ঢাকনা হিসেবে ব্যবহার করা হল ব্লো-আউট প্রতিরোধকের অংশবিশেষ—ব্লাইন্ড র‍্যাম্। এই ঢাকনার এক কপাটিকার সাহায্যে কাদাগোলা ক্রমাগত আবরণ পাইপের ভেতর পাঠানো হতে লাগল যাতে অতিরিক্ত চাপকে কমিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়।

30 শে জুলাই অবধি খননের কাজ বন্ধ রইল। এই দুদিন সঠিক কি কি করা হল তা বিস্তারিতভাবে জানা যায়নি। তবে এ অবস্থায় যা করা উচিৎ ছিল তা হল কয়েক ঘন্টা অন্তর অন্তর পাইপের চাপ পরীক্ষা করা। নিয়মিতভাবে এরকম পর্যবেক্ষণ করে যদি ড্রিলাররা সন্তুষ্ট হয় যে চাপ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীনে, তবেই তেলকুপ খননের কাজ আবার চালানো যেতে পারে। সেরকম উচ্চচাপ সৃষ্টি হলে কূপকে অনেক সময় পরিত্যাগ করা হয়। পরের যে ঘটনা জানা যায়

তা হল কিছু অত্যুৎসাহী ড্রিলার আবার খননকার্য শুরু করবে স্থির করে। রাত তখন নটা। অবস্থা যে অনুকূল এ ব্যাপারে কিন্তু ঐক্যমত গড়ে ওঠেনি। সকলে সমান আত্মবিশ্বাসী নয়, তবু তার মধ্যে কয়েকজন নিজেদের উপর যথেষ্ট আস্থাশীল – হয়ত একটু বেশীই। ওদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করল সাগর বিকাশের কিছু প্রযুক্তিবিদ। কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না

আবরণ পাইপের ঢাকনা ধীরে ধীরে খোলা হল। ওর ভেতরে ঢোকানো ড্রিলপাইপটা তোলার জন্য একটা নতুন ড্রিলপাইপ প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। শায়িত ড্রিলপাইপের উপর দুদিন ধরে কাদাগোলা জমা হয়ে গ্যাসের চাপকে উপরে উঠতে বাধাসৃষ্টি করছিল (চিত্র নং 6.4) নতুন ড্রিলপাইপ কাদাগোলার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করাতে তলাকার গ্যাস নতুন পাইপের ফাঁপা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসার রাস্তা পেয়ে গেল। আবরণ পাইপের মুখটা তখন খোলা – না আছে ব্লো-আউট প্রতিরোধক, না তার ঢাকনা আটকানো। তাই যা হবার তাই হল। ওই প্রচন্ড বেগে গ্যাস বেরিয়ে আসা, আটকানো বা আবরণ পাইপের মুখটা বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

সাগর বিকাশের পাটাতনে 74 জন কর্মী তখন কর্মরত। ওখানে অবস্থিত ক্রেনের সাহায্যে পাশে দাঁড়ানো একটা নৌকার উপর এক এক করে সকলকে নামিয়ে দেওয়া হল। প্লাটফর্মের পাশে নৌকা মজুত রাখা সবত্রই একটা অলিখিত প্রথা। সেখান থেকে সমস্ত কর্মীদের অপসারণের কাজে সময় লেগেছিল ১৫ মিনিট। ভাবতে অবাক লাগে এর মাত্র দুমাস আগে সাগর বিকাশ তার নিজস্ব সংস্থা থেকে সবচেয়ে ভাল ও নিরাপদ কাজ করার জন্য পুরস্কার পেয়েছিল।

আগুন যা হোক নিবে গেল, কিন্তু অবিরাম গতিতে গ্যাস বেরিয়ে যেতে লাগল কূপ থেকে। গ্যাসের সঙ্গে সাধারণতঃ তেলও নির্গত হয়। আর তা যদি প্রচুর পরিমাণে হয়, তবে সমুদ্রের জল দুষিত হয়ে যাবে। এই গ্যাসের বর্হিগমন অনতিবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে! এ এক বিশেষ ধরনের কাজ যা পৃথিবীর মধ্যে খুব অল্প লোকই পারে। এদের মধ্যে রেড অ্যাডেয়ার অগ্রণী। অতএব আর কালক্ষেপ না করে অ্যাডেয়ার সাহেব কে তলব করা হল।

পোশাকী নাম পল নীল কিন্তু সকলের কাছে রেড্ নামেই পরিচিত। লাল চুলের অধিকারী পল আগেকার দিনে ফায়ার ব্রিগেডের লোকের মত লাল পোশাক পরে লাল গাড়ি চড়ে বেড়াত বলে লোকেরা তাকে 'লাল' (রেড) বলে জানে। তেলকূপে আগুন বা ব্লো-আউট বন্ধের কাজে জীবন অতিবাহিত এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি এক

বিশিষ্ট চরিত্র। ডজন খানেক রোমাঞ্চকর গল্পের নায়ক তিনি। অনেক টেলিভিসন ছবি তৈরী হয়েছে। রোলেক্স ঘড়ির বিজ্ঞাপনে তাঁর ছবি মুদ্রিত হয়েছে বহু পত্রপত্রিকায়। হলিউডের ব্যয়বহুল চিত্র 'হেলফাইটারস' – এর মুখ্য চরিত্র তিনি – যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিখ্যাত চিত্রতারকা জন ওয়েন।

এক কর্মকারের পুত্র রেড্ আডেয়ারের জন্ম আমেরিকার হিউসটনে 1916 সালে। বিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। রোমাঞ্চের সন্ধানে যে মন নিয়ত ব্যস্ত, সে কি করে বইয়ের 'শুকনো' পাতা থেকে রস গ্রহণ করবে! এখানে ওখানে কাজ করতে করতে 1938 সালে একদিন তিনি হাজির হন আমেরিকার তখনকার দিনের অগ্রগণ্য তেলকূপ-অগ্নিযোদ্ধা সাইরন কিনলের দরবারে। তার পর থেকেই তিনি এ কাজে ব্যাপৃত। পরে তিনি নিজের নামে একটা প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনা করেন।

তাঁর দক্ষতা সম্বন্ধে বহুরকমের খবর পাওয়া যায়। একবার ব্লো-আউটের ফলে তিনি শূন্যে 50 ফুট উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং মাটি স্পর্শ করার পর তার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তিনি আর একবার ফুটন্ত জলের কূপে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শরীরের প্রতিটি অস্থিই নাকি কোন না কোন সময়ে ভেঙ্গেছে! একবার তাঁর শরীর এতই জখম হয়েছিল যে ডাক্তাররা বলেন যে তিনি আর জীবনে হাঁটতে পারবেন না। তিনি সুদক্ষ ব্যবসায়ীও। ব্যবসার প্রসারের জন্য নিজের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে তিনি 1962 সালে আলজেরিয়ার গাসি টোমিল তেলকূপের 450 ফুট উঁচু আগুনকে দেখেছিলেন, তাও তিনিই নিবিয়ে ছিলেন। তিনি এযাবৎ 2500 থেকে 3000 ব্লো-আউট বন্ধ করেছেন। একাজ সম্পাদন করতে তিনি যে পারিশ্রমিক দাবি করেন তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। 1977 সালে উত্তর সাগরে আট দিন কাজ করার জন্য তিনি সাড়ে ছ কোটি টাকা নিয়েছিলেন। ব্লো – আউটের সঙ্গে অগ্নিসংযোগ ঘটলে তাঁর প্রাপ্যের অঙ্ক বেড়ে যায়। রেড অ্যাডেয়ার বম্বে এসে হাজির হয়েছিলেন 11 আগষ্ট। তবে 3 আগষ্ট তিনি তার প্রতিষ্ঠানের তিন কর্মী – রেমন্ড হেনরী, বিলি ড্রেয়ার এবং ড্যান্পি ক্লেটনকে বম্বে পাঠিয়েছিলেন সরজমিনে তদন্ত করার জন্য। এদের মধ্যে হেনরী 1970-71 সালে মেক্সিকো উপসাগরে 23 টা তেলকূপে একসঙ্গে আগুন লাগতে দেখেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে ব্লো-আউট বন্ধ করা যায়। প্রথম পদ্ধতিটি হল সমুদ্রের জল কূপের ভেতর ঢুকে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে যাতে তেল বা গ্যাস উপরে উঠতে দিতে না পারে তার জন্য ডিনামাইট দিয়ে তেলকূপ খননের সবকটা পাইপকে উড়িয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় পন্থাটি হল ত্রাণকূপের সাহায্যে ব্লো-আউট নিয়ন্ত্রণ

করা। গ্যাস বা তেলের উর্ধচাপের সমতা ফিরিয়ে আনতে দুর্ঘটনা থেকে কিছু দূরে আড়াআড়ি ভাবে কূপ খনন করে প্রথমে কূপের সঙ্গে যোগ করা হয় এবং তা দিয়ে উচ্চচাপে কাদাগোলা জল পাঠানো হয়। ব্লো-আউট নিবারণের আর একটা উপায় হল অত্যন্ত উচ্চ চাপের সঙ্গে গ্যাসের বিপরীতে চালনা করে একটা ঢাকনা দিয়ে তেলকূপের মুখ বন্ধ করা। ওই তিনটে উপায়ের মধ্যে কোনটা অবলম্বন করা হবে তা নির্ভর করে ব্লো-আউটের বৈশিষ্ট্য এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর।

ব্লো-আউট বন্ধের সাজসরঞ্জাম যোগাড় করতে কয়েকদিন লেগে যায়। অথচ যে কোন মুহূর্তে আগুন লেগে যাওয়া ছাড়াও গ্যাসের সঙ্গে নির্গত তেলবিন্দুর জন্য সমুদ্র দূষণের আশঙ্কা দেখা দেয়। সেরকম ভরাট তেলকূপ হলে গড়ে প্রতিদিন 30000 টন পর্যন্ত তেলের নিষ্ক্রমণ হতে পারে। এতে সামুদ্রিক প্রাণী ছাড়া মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ নিয়ে অন্য এক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে সমুদ্রের স্তর থেকে এই তেল পরিশোধন যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। উত্তর সাগরে রাসায়নিক বিকিরণের সাহায্যে তেল পরিশুদ্ধ করতে 1976 সালে খরচ পড়েছিল প্রতি 100 টনে 77000 টাকা। তবে সাগর বিকাশে ব্লো-আউটে ভাগ্য কিছুটা সহায়ক ছিল, কারণ বেরিয়ে আসা তৈলবিন্দু জলে পড়ার আগেই গ্যাস হয়ে উবে যাচ্ছিল। সাগরের বিক্ষুব্ধ অবস্থা ও বাতাসের প্রবল বেগের জন্যই এটা হচ্ছিল।

ব্লো-আউট শুরু হবার পর বহুরকমের জলযানের প্রয়োজন হয়। অন্যান্য তরীর মাঝে বোম্বেতে হাজির হয়েছিল হারকিউলিস ও ডিক্সিলন ফিল্ড 95 অর্ধভাসমান জাহাজ। এছাড়া বেশ কিছু সরবরাহ তরী হাতের কাছে ছিল।

প্রথমে সাগর বিকাশের পাটাতনে উঠে সেটাকে সরেজমিনে পরীক্ষা করা হল। ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ধাতু জাতীয় সমস্ত জিনিস সরিয়ে ফেলা হল। পাটাতনকে দাঁড়িয়ে কাজকর্ম করার উপযোগী করতে এস. জে 5 প্লাটফর্মের পাটাতনের কিছু অংশ পুড়িয়ে ফেলা হল। এরপর ক্রেন বাজরা হারকিউলিসকে সাগর বিকাশের কাছে এনে আটটা নোঙ্গর দিয়ে এমনভাবে বেঁধে রাখা হল যাতে সাগরের বুকে নড়াচড়া করার ক্ষমতা তার অবলুপ্ত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে জিনিসটা পাটাতনে তোলা হল, তা হল একটা 70 টন ক্রেন। আবরণ পাইপ বেশ কিছু কাটা ছেঁড়া করা হল। ইতিমধ্যে এই পাইপের মুখ চিরতরে বন্ধ করার জন্য এক বিশেষ ঢাকনা তৈরি করে আনা হয়েছে সিঙ্গাপুর থেকে। গ্যাসের প্রচন্ড চাপকে উপেক্ষা করে 90 টন ক্রেনের সাহায্যে এই ঢাকনা পাইপের মুখে বসিয়ে দেওয়া হল। এর পরের কাজ ঢাকনাটাকে সঠিক ও শক্তভাবে আটকে

দেওয়া। কূপটা পুরোপুরি রুদ্ধ করতে ঘন কাদা ও সিমেন্ট এই ঢাকনার এক কপাটিকা দিয়ে ক্রমাগত প্রবেশ করানো হতে লাগল। অবশেষে 12ই সেপ্টেম্বর সূর্য ভাদ্রের মেঘমালার মধ্য দিয়ে উঁকি মেরে উঠল, হয়ত 44 দিন প্রাকৃতিক রোষের অবসানের কথা ঘোষণা করল।

এই ব্লো-আউটের ব্যাপারে কি ক্ষয়ক্ষতি হল তা জানার ব্যাপারে কৌতূহল জাগতে পারে। শুধু সাগর বিকাশই বিনষ্ট হল মনে করলে ভুল হবে। এস্ জে 5 প্লাটফর্মের পাটাতনের অশেষ ক্ষতি হয়েছিল। বিভিন্ন রকমের যে সব জলযান কাজে লাগানো হয়েছিল ব্লো-আউটরোধের জন্য তাদের ভাড়ার অঙ্ক কিছু কম নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ভাড়া করার খরচা। রেড্ অ্যাডেয়ার কোম্পানিকে ধরে দিতে হয়েছে এক বিশাল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা। যে গ্যাস কূপ থেকে মুক্তি পেল, তাকে ফেরৎ পাবার আর কোন প্রশ্নই থাকল না! আর, এতদিন সমুদ্রে তেলকূপ খননের ব্যাপারে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের যে সাদা ধবধবে রেকর্ড ছিল তাতে হয়ত একটা দাগ পড়ল। সব মিলিয়ে টাকার অঙ্কে ক্ষতির পরিমাণ কত হয়েছিল সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, তবে তা অনেকের মতে অঙ্কটা 100 কোটি টাকায় দাঁড়ালে অবাক হবার কিছু নেই।

ব্লো-আউট নিয়ন্ত্রণের পর এস জে 5 প্লাটফর্মে নতুন পাটাতন বসিয়ে কিছুদিনের মধ্যে আবার সেখানে তেলকূপ খনন করে উৎপাদন শুরু করা হল। আর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সাগরবিকাশকে সমুদ্র থেকে তুলে ক্রেনে করে তীরে নিয়ে আসা হয়। তারপর তাকে নিলাম করে দেওয়া হয়।

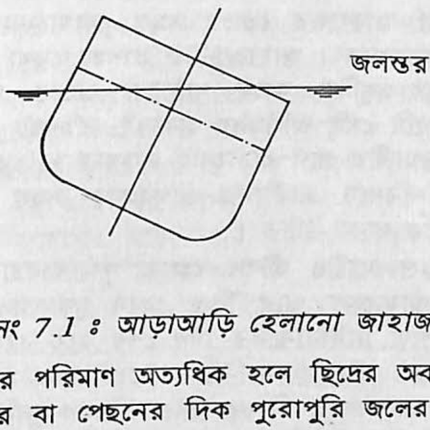
৭

টাইটানিক তলিয়ে যাবার আগে ও পরে

টাইটানিক তলিয়ে যাবার ঘটনা আজ আর বিশ্বের কাছে অজানা কিছু নয়। কিন্তু এই বিখ্যাত জাহাজ টাইটানিক ডুবে যাবার আগে বা পরে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তা যেমন রহস্যে ভরা তেমনি এই জাহাজডুবির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভবিষ্যৎ সাগরপোতের গঠন, ত্রাণ ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসা। এখন টাইটানিক সমুদ্রের তলায় সোজা হয়ে বসে আছে। 75 বছরেরও আগে তার ভাসমান অন্তিম মুহূর্তগুলোতে জাহাজটিকে সোজা করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে সোজা হতে পেরেছিল একেবারে সাগরতলে। ডুবোযানের টেলিভিসান ক্যামেরা থেকে পাঠানো ছবি দেখে মনে হয়েছে যে সেটা যেন ডুবন্ত এক যাদুঘর। সমুদ্রের যে অঞ্চলে তার বর্তমান অবস্থান, বছরের অধিকাংশ সময় সেখানকার জল প্রায় হিমশীতল। ওই ঠাণ্ডায় সবকিছু অটুট থাকে। তাই বুঝি টাইটানিক ভেসে ওঠার প্রহর গুনছে? গত 75 বছরের বেশি সময় ধরে সে সমুদ্রের যে স্তরে অপেক্ষা করছে সেখানে তাকে আরও কত বছর থাকতে হবে কে জানে! বহু টাকা খরচ পড়বে তাকে জলের উপরে উঠিয়ে আনতে।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে আজকের জাহাজের সামুদ্রিক নিরাপত্তার সঙ্গে টাইটানিক জাহাজডুবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যে জাহাজের সাগরজলে নিমজ্জন ছিল প্রায় অকল্পনীয়, নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে সে তার প্রথম যাত্রা সমাপন করার আগেই পাথারের অতলে সমাধি লাভ করল, প্রায় দেড় হাজার নরনারী সেদিন আটলান্টিকের বরফগোলা জলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সে ট্রাজেডির বিবরণ পড়ে। সেই অর্ণবপোত পাড়ি দিচ্ছিল ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা। আর এই দুই দেশই জাহাজডুবির কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিশন বসিয়েছিল। আমেরিকায় চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সিনেটার অ্যালডেন স্মিথ। আর বৃটিশ কমিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লর্ড মারসী। দুটোর ভেতর বৃটিশ রিপোর্ট ছিল অনেক আন্তরিক বিশদ পুঙ্খানুপুঙ্খও বটে। আর তাতে ভবিষ্যতে সিন্ধু মাঝে যাত্রা নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে ছিল কিছু সুপারিশ।

টাইটানিক নিয়ে আলোচনা করার আগে জাহাজডুবির কিছু কারণ আলোচনা করা যেতে পারে। জাহাজ সাধারণতঃ তিনভাবে ডুবে যেতে পারে। প্রথমতঃ, জাহাজের ভেতর জল ঢুকে এমন অবস্থা দাঁড়াতে পারে যে সে ধীরে ধীরে উল্লম্ব ভাবে সমুদ্রের জলস্তর থেকে নিচে চলে যেতে থাকে এবং এইভাবেই সে সাগরের বুকে নিমজ্জিত হয়। দ্বিতীয়ত, জাহাজের একপাশের ছিদ্র দিয়ে জল ঢুকতে ঢুকতে সে আড়াআড়ি ভাবে কাত হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় পুরো ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত জাহাজটি ক্রমাগত হেলতেই থাকবে (চিত্র নং 7.1)। তৃতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে জাহাজ লম্বালম্বিভাবে হেলে



চিত্র নং 7.1 ঃ আড়াআড়ি হেলানো জাহাজ

যেতে পারে। এর পরিমাণ অত্যধিক হলে ছিদ্রের অবস্থানের উপর জাহাজের সামনের বা পেছনের দিক পুরোপুরি জলের তলায় চলে যায়। এর ফলে আরও বেশি জল জাহাজে প্রবেশ করতে থাকে এবং দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে বেশি অংশ আস্তে আস্তে নিমজ্জিত হতে থাকে। জাহাজ পুরোপুরি জলের ভেতর প্রবেশ না করা পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে (চিত্র নং 7.2)।



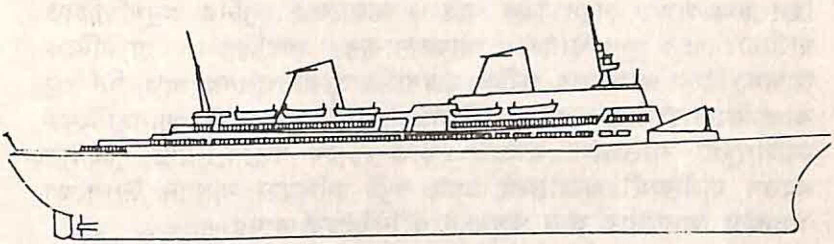
চিত্র নং 7.2 ঃ লম্বালম্বি হেলানো জাহাজ

জাহাজের ভেতর জল প্রবেশ করলে তা যাতে চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য আড়াআড়িভাবে জলরোধক বেষ্টনী বা বাল্কহেড দিয়ে জাহাজকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়। দুটো বেষ্টনীর মধ্যবর্তী অংশকে হোল্ড বা কম্পার্টমেন্ট বলে। এর ফলে একটা হোল্ডে জল ঢুকলে তা অন্যটাতে যেতে পারে না। তার জন্য জাহাজের নিরাপত্তা অনেক বেড়ে যায়। জাহাজ বানানোর সময় কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যে পরপর দুটো বা তিনটে হোল্ড পূর্ণমাত্রায় জলমগ্ন হলেও যেন জাহাজ ডুবে না যায়। সতর্কতা হিসেবে জাহাজে আরো অনেক ব্যবস্থা মেনে চলা হয়।

ঝঞ্ঝাবর্ত সঙ্কুল সমুদ্রের অতিরিক্ত জলোচ্ছ্বাসে বা অন্য কোন কারণে ছিদ্র মারফৎ জলের অনুপ্রবেশ মানেই যে জাহাজের অন্তিমলগ্ন সমুপস্থিত, এ জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিন্তু ঠিক নয়, যদিও এক্ষেত্রে সমস্তরকম প্রতিরোধক গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই সঙ্কটমুহূর্তে জাহাজের ভেতর সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক। জাহাজডুবির আশঙ্কা দেখা দিলে সে বার্তা নিকটবর্তী জাহাজগুলির কাছে পাঠানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আর যদি সেই অন্তিমলগ্ন একান্তই সন্নিকটে মনে হয়, তখন প্রত্যেক জাহাজযাত্রীর প্রাণ বাঁচানোই একমাত্র দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয়। এহেন বিপদে যাত্রীদের প্রাণরক্ষার সমস্ত রকম সুব্যবস্থা জাহাজের ভেতর থাকা উচিত।

একমাত্র সমস্ত যাত্রীর জীবন রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থার অভাব ছাড়া টাইটানিক জাহাজের আর কিন্তু কোন দুর্বলতা ছিল না। যে পরিস্থিতিতে পড়ে টাইটানিকের দিন শেষ হয়ে এসেছিল, আজকের শ্রেষ্ঠতম জাহাজও তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হত না। জাহাজ তৈরি সংক্রান্ত তখনকার দিনের সমস্ত নিয়মকানুনই সুষ্ঠুভাবে মানা হয়েছিল টাইটানিক তৈরীর সময়ে। মারসীসাহেবও এ ব্যাপারটা স্বীকার করেছেন। টাইটানিকের বহু ইঞ্জিনিয়ার ও প্রধান নৌস্থপতি সেদিন আটলান্টিকের বুকে সলিল সমাধি লাভ করে। তাই বহু মূল্যবান তথ্য অজানা রয়ে গেছে। তাছাড়া তদন্ত কমিশনের রিপোর্টগুলো জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এই জাহাজডুবি সংক্রান্ত সমস্ত প্রকাশিত রচনাই যাত্রীর অভিমত সম্বলিত। তাই প্রত্যেক রচনাতেই বহু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, বিশেষ করে বাংলা ভাষায় যেগুলো দেখা গেছে।

টাইটানিকের মালিকের নাম হোয়াইট স্টার লাইন কোম্পানী (চিত্র নং 7.3)। তার পরিকল্পনাকার ও নির্মাতা ছিল বিলিতি প্রতিষ্ঠান হার্টল্যান্ড এণ্ড উল্ফ। টাইটানিকের যাত্রারম্ভ কিন্তু শুভ ছিল না। বৃটেনে তখন কয়লা শ্রমিকদের ধর্মঘট চলছিল। তাই এই যাত্রার জন্য প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত কয়লা একেবারেই ছিল না। যাত্রার



চিত্র নং 7.3 ঃ যাত্রীবাহী জাহাজ

শেষ পর্যায়ে কয়লার অভাব দেখা দিলেও দিতে পারত। 55000 অশ্বশক্তিযুক্ত 46328 টনের এই জাহাজ প্রণালী থেকে সমুদ্রে পড়ার মুখে প্রায় দুর্ঘটনায় পড়েছিল। আর একটু হলেই আমেরিকান জাহাজ 'নিউ ইয়র্কে'র সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছিল আর কি! নিউ ইয়র্কের নোঙর ছেঁড়ার উপর দিয়ে এ যাত্রা রক্ষা হয়েছিল।

প্রথম যাত্রাতে এই জাহাজের অনেক আসন কিন্তু শূন্য পড়েছিল। 2603 সংরক্ষিত আসনের মধ্যে মাত্র 1316 আসন পূর্ণ হয়েছিল (সারণি নং 7.1)। আটলান্টিকের জলস্পর্শ সে করল 1912 সালে। লক্ষ্যস্থল নিউ ইয়র্ক শহর। যে পথ দিয়ে সে যাবে সে পথ বরফে

সারণি নং 7.1: টাইটানিকের যাত্রী ও জীবিতের সংখ্যা

	সংরক্ষিত আসন	যাত্রীসংখ্যা		জীবিতের সংখ্যা	
		নারী ও শিশু	পুরুষ	নারী ও শিশু	পুরুষ
প্রথম শ্রেনী	905	150	175	146	57
দ্বিতীয় শ্রেনী	564	117	168	104	14
তৃতীয় শ্রেনী	1134	244	462	103	75
জাহাজ কর্মী			885		212

আটকে দেবে না বটে, কিন্তু এপ্রিল, মে ও জুন মাসে সেখানে স্থানে স্থানে তুষারস্রোত দেখা যায়। তবে জাহাজের ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড চার্লস স্মিথ এবং তার সহকর্মীরা খুবই অভিজ্ঞ। ক্যাপ্টেন স্মিথ 43 বছর সমুদ্রে ঘুরছেন। টাইটানিকের যাত্রা সাঙ্গ করে অবসর নেবেন ঠিক করেছিলেন।

ভাসতে ভাসতে 14ই এপ্রিলের অপরাহ্ণ উপস্থিত হল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের কিংবদন্তী জাহাজ। যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি কোথাও নেই। সুস্বাদু আহারের মহা সমারোহ। সেদিন আবহাওয়া ছিল চমৎকার। সমুদ্র ছিল শান্ত। জাহাজের দুলুনির অনুপস্থিতিতে যাত্রীরা এক অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিল। চারিদিকে আত্মসন্তুষ্টি। জাহাজের জটিল যন্ত্রপাতি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নির্বিঘ্নে কাজ করে চলেছে। মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা পেরোলেই ম্যানহাটনের আকাশচুম্বী বাড়িগুলো জাহাজ থেকে চোখে পড়বে, আর পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজের প্রথম সমুদ্র অভিযান সমাপন উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত হবে নিউইয়র্ক বন্দর।

তখন রাত প্রায় বারোটা। ক্যাপ্টেন স্মিথ তাঁর কেবিনে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর পরিবর্তে প্রথম অফিসার মার্ডক কর্মে লিপ্ত। মাস্তুলের উপর কক্ষে লি আর ফ্লিট সতর্কদৃষ্টি রেখে চলেছেন। 21 নট গতিতে জাহাজ ভেসে চলছে। হঠাৎ ফ্লিটের নজর পড়ল খুবই কাছে ভাসমান একটা কালো জিনিসের ওপর। চাঁদের আলোর অভাবে যথেষ্ট দূর থেকে তাকে চিনে ওঠা সম্ভব হয়নি। অনেক সময় ছোট ছোট ঢেউয়ের আঘাত স্মরণ করিয়ে দেয় জলের উপর উৎক্ষিপ্ত বস্তুর অবস্থান। কিন্তু সাগর সে রাতে ছিল পুকুরের মত শান্ত। কিন্তু ভাগ্য নিতান্তই অপ্রসন্ন, বস্তুটার স্বাভাবিক বর্ণ থাকলেও ঘন কৃষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যেত অনেক আগে। কিন্তু, হিমবাহের যে অংশটা জলের তলায় থাকে, তা উল্টে গিয়ে জলের ওপরে ভেসে উঠেছিল, তাই হিমবাহের উপরের অংশে যে স্বাভাবিক শুভ্রতা নাবিকরা আশা করে তা হয়ে গিয়েছিল অনেকাংশে ম্লান। ফ্লিটের আর সন্দেহ রইল না হিমবাহ খুবই কাছে। তৎক্ষণাৎ সে সতর্কবাণী বাজিয়ে ব্রীজে ফোন করে দিল, "সাবধান! সামনেই হিমবাহ—মাত্র 500 গজ দূরে।" মার্ডক আঁৎকে উঠলেন। জাহাজ সোজা গিয়ে আঘাত করতে চলেছে ওই বিরাট তুষারখণ্ডকে। জাহাজকে পাশে বাঁকানো বা পেছন ফেরানোর পক্ষে এই দূরত্ব কিছুই নয়। হায় জাহাজে মোটর গাড়ীর মত যদি ব্রেক থাকত! বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী, তবু যেটুকু শেষ চেষ্টা করা যায়।

জাহাজ একটু ঘুরল বটে, কিন্তু তার একটা পাশ হিমবাহের সঙ্গে ঘষে গেল। সংঘর্ষের আকস্মিকতায় ও প্রচণ্ডতায় যাত্রীসমূহ সচকিত হয়ে উঠল। জাহাজের মাস্তুল উৎপাটিত হয়ে ডেকের উপর আঘাত করল। কিছু কিছু কেবিন নিমেষেই বিকৃত ও কুঞ্চিত রূপ ধারণ করল। ক্যাপ্টেন স্মিথ দুঃস্বপ্নের ঘোরে জাহাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ কারী কক্ষ হুইল হাউসে দৌড়লেন।

আঘাতের গুরুত্ব বুঝতে স্মিথের বেশি সময় লাগল না।

অনতিবিলম্বে তিনি আবিষ্কার করলেন জাহাজের চারটে হোল্ড একপাশ থেকে বিদীর্ণ হয়েছে এবং তাতে অনবরত জল ঢুকছে। তিনটে হোল্ড ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জাহাজকে বাঁচানোর একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল। জাহাজ তৈরি হয়েছিল এমনভাবে যে পরপর যে কোন দুটো কম্পার্টমেন্ট জলে পরিপূর্ণ হলেও সে ডুবে যেত না। এমন পরিস্থিতিতে আর কিছু করার থাকল না। এখন একমাত্র কর্তব্য যাত্রীদের প্রাণ বাঁচানো। আর সেইখানেই ছিল টাইটানিকের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। যেখানে জাহাজকর্মীসহ যাত্রীর সংখ্যা ছিল 2201। সেখানে লাইফবোট ছিল মাত্র 1178 জনের জন্য।

স্মিথ ওয়ারলেস অপারেটর ফিলিপস্‌কে তক্ষুণি বিপদ সংকেত ঘোষণা করতে আদেশ দিলেন। শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের দৌলতে সে বার্তা সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। টাইটানিকের সবচেয়ে কাছের যে জাহাজ ছিল তার নাম ক্যালিফোর্নিয়ান। সেখান থেকে 500 মাইল দূর দিয়ে যাচ্ছিল হোয়াইট স্টার লাইনের জাহাজ অলিম্পিক। কিন্তু এ দূরত্ব তো অতিক্রম করতে লেগে যাবে পুরো একদিন। অ্যালান লাইনের ভার্জিনিয়ান ও কিউনার্ড লাইনের ক্যারোনিয়ার কাছে বিপদের খবর পৌঁছল। সবচেয়ে নিকটতম যে জাহাজ টাইটানিকের বিপদে সাড়া দিয়েছিল তার নাম কারথিপিয়া, সে দুর্ঘটনা স্থল থেকে 58 মাইল দূরে।

একঘন্টা, বড় জোর ঘন্টাদেড়েক টাইটানিক ভেসে থাকতে পারে। গরম জামাকাপড় পড়ে যাত্রীদের লাইফবোটের সামনে হাজির হতে বলা হল। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে দোটানায় যাত্রীদের মধ্যে ক্যাপ্টেনের ডাকে সাড়া দিতে প্রথমদিকে তৎপরতার কিছুটা অভাব দেখা যায়। তাই রাত 12-45 মিনিটে প্রথম লাইফ-বোট যখন জলে নামানো হল তখন তার অনেক আসনই শূন্য ছিল। প্রথা অনুসারে সমস্ত নারী ও শিশুর স্থানসঙ্কুলানের পরই পুরুষদের লাইফবোটে আসন গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। তাছাড়া পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজের যাত্রীরা প্রথমদিকে ওই দীনদরিদ্র তরুনির্মিত জীবনরক্ষা তরীতে আরোহণ করতে যথেষ্ট অনিচ্ছুক ও অপারগ ছিল। একে অর্ধেক সংখ্যক লোকের লাইফবোটে আসনের অভাব, তার উপর প্রথমদিকের লাইফবোটগুলি প্রায় অর্ধেক আসন শূন্য অবস্থাতেই নামানো হচ্ছিল। যত অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসতে লাগল, তত পুরুষদের উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হল। তখন জীবনমরণের সীমানায় দাঁড়িয়ে আর বাছবিচার করার ফুরসৎ যাত্রীদের ছিল না। 2.05 মিনিটে শেষ লাইফবোট নামানো হল। আর ঠিক তার পনের মিনিট পরে 1490 জন যাত্রী নিয়ে টাইটানিক আটলান্টিকের অতলে তলিয়ে গেল।

যাত্রার প্রারম্ভেই 'নিউ ইয়র্কে'র সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়াতে যাত্রী ও

নাবিকদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা হয়েছিল যে টাইটানিক নিমগ্ন হওয়ার লগ্নে জলে যে চাপসৃষ্টি হবে, তাতে তার নিকটবর্তী সমস্ত নৌকা জলের ভেতর প্রচন্ড বেগে আকর্ষিত হবে। তাই সব লাইফবোট টাইটানিকের থেকে দূরে দূরে সরে গিয়েছিল। টাইটানিক যে মুহূর্তে ডুবল, তখন যদি তার কাছাকাছি কিছু লাইফবোট থাকত, সে ক্ষেত্রে হয়ত আরও কিছু লোকের প্রাণরক্ষা হতে পারত।

টাইটানিকের জলমগ্ন যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ওই জাহাজের প্রধান নৌস্থপতি টমাস এন্ড্রুজ। জাহাজের নির্মাতা হার্টল্যান্ড এন্ড উল্‌ফের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যাত্রাসঙ্গী হন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এন্ড্রুজ প্রচন্ড পরিশ্রম করতে পারতেন। অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও স্বীয় মেধার জোরে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে ওঠেন। তাঁর নেতৃত্বে বেশ কিছু বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছিল। টাইটানিকের সমুদ্র ট্রায়াল থেকেই তিনি তার নিত্যসহচর। হয়ত নিজের সৃষ্টির বাস্তব রূপ পরিগ্রহণের সামগ্রিক চিত্র জানতে তিনি কৌতূহলী ছিলেন। টাইটানিক ভাসতে ভাসতে 11ই এপ্রিল চেরবুর্গে পৌঁছলে এন্ড্রুজ তাঁর স্ত্রীকে লেখেন, "সুন্দর আবহাওয়া, একটা উত্তম যাত্রার পক্ষে সমস্ত পরিবেশ অনুকূল। জাহাজের ভেতর সবকিছু দারুণভাবে কাজ করে চলেছে"। ক্যাপ্টেন স্মিথ জাহাজে জল ঢোকামাত্রই এন্ড্রুজকে জল অনুপ্রবেশকারী হোল্ডগুলো পরিদর্শনের জন্য নিয়ে যান এবং তাঁর কাছ থেকেই স্মিথ জানতে পারেন যে জাহাজের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। সন্দেহ নেই সেটা ছিল এন্ড্রুজের জীবনের নিদারুণ, মর্মান্তিক ও তিক্ততম মুহূর্ত। তাঁকে শেষ দেখেছে জাহাজের এক নাবিক। প্রথম শ্রেণীর ধূম্রপানকক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন বজ্রাহতের মত। পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার তাঁর মুখের উপর নেমে এসেছে, যদিও যা ঘটতে চলেছে তার জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী তিনি নন।

ডুবন্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 1332 জন পুরুষ ও 158 নারী ও শিশু ছিল। ভোর চারটে নাগাদ কারথিপিয়া টাইটানিকের নিমগ্ন হওয়ার স্থানে এসে হাজির হল। লাইফবোট থেকে এক এক করে যাত্রীদের জাহাজে তুলে নেওয়া আরম্ভ হল। সে মুহূর্তে বহু নারী আশা রেখেছিল স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার, বহু শিশুর উৎকণ্ঠিত চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাদের পিতাকে।

তদন্ত কমিশনের সামনে যে প্রসঙ্গগুলো উঠেছিল, তার মধ্যে ছিল জাহাজ তৈরির ত্রুটি, জাহাজে পর্যাপ্ত লাইফবোটের অভাব, প্রয়াত ক্যাপ্টেনের হঠকারী জাহাজ পরিচালনা এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ ইত্যাদি। সে যুগের সমস্ত নিয়ম পালন করেই টাইটানিক নির্মিত হয়েছিল। ত্রুটি

যদি কিছু হয়েই থাকে তা তার নিয়মেই নিহিত এবং জাহাজনির্মাণে ঘটেছে তারই প্রতিফলন অর্থাৎ প্রধান নৌস্থপতি এন্ড্রুজকে এ ব্যাপারে কোনমতেই দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

হিমবাহের সম্ভাব্য উপস্থিতি সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন স্মিথ অবহিত ছিলেন। এ ব্যাপারে আটলান্টিকের ওই এলাকার চারপাশের ছ'টা জাহাজ থেকে সংবাদ এসেছিল। ওয়ারলেস অপারেটর এর মধ্যে চারটে খবর ব্রীজে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ দুটো খবর পৌঁছে দিতে তার অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ সেসময় ওয়ারলেসের মাধ্যমে নিউ ইয়র্কে যাত্রীদের বার্তা পৌঁছে দিতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তাই প্রশ্ন ওঠে এ অঞ্চলে হিমবাহ আছে জেনেও ক্যাপ্টেন জাহাজের গতি কেন কমালেন না। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল গতি হ্রাস না করে এই সব অঞ্চলে খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখে জাহাজ চালানো। সাধারণতঃ যথেষ্ট দূর থেকেই হিমবাহকে চিহ্নিত করা যেত। এর আগে খুব কম জাহাজই এরকম দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। 1892 থেকে 1911 সালের মধ্যে 95 লক্ষ যাত্রী বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিল। তার মধ্যে মাত্র 82 জন জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। রেকর্ড সময়ে আটলান্টিক পার হবার কোন অভিলাষ ক্যাপ্টেনের ছিল না। তিনি প্রচলিত ধারাতেই জাহাজ চালিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন স্মিথ কোন নিয়মভঙ্গ করেননি। লর্ড মারসী তাঁকে সমস্ত অভিযোগের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

সব যাত্রীই যেন লাইফবোটে জায়গা পায়, এরকম নিয়ম তখনকার দিনে ছিল না। বর্তমান ক্ষেত্রে একে তো স্থানাভাব, তার উপর লাইফবোটের মাত্র দুই তৃতীয়াংশ স্থানের সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল। তাই ট্রাজেডির সামগ্রিক চিত্র আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ভবিষ্যতে প্রত্যেক যাত্রীই লাইফবোটে যেন স্থান পায়, এজন্য নিয়ম প্রণয়ন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থান জাহাজের দুই প্রান্তে ছিল। সাধারণতঃ তাদের অধিকাংশেরই জাহাজের মধ্যবর্তী অংশের সঙ্গে পরিচিতির যথেষ্ট অভাব ছিল। লাইফবোটে উঠতে গেলে বোটডেকে আসতে হয়, আর সেটার অবস্থান জাহাজের মাঝখানে। তাছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রীই বৃটেনেই পাততাড়ি গুটিয়ে আমেরিকায় পাকাপাকিভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। দেশের স্মৃতিসম্বলিত অনেক কিছু জিনিসপত্র তাদের সঙ্গে ছিল যা পরিত্যাগ করে যেতে অপরাগ ছিল তারা। তবে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বলে লাইফবোটে উঠতে দেওয়া হয়নি, এরকম কোন প্রমাণ মেলেনি।

শেষ মুহূর্তে দিক পরিবর্তন না ক'রে টাইটানিক যদি সামনাসামনি হিমবাহকে আঘাত করত, তবে জাহাজের সামনের

100 ফুট নিঃসন্দেহে ভেঙে চুরমার হয়ে যেত এবং সামনের ওই অংশে প্রত্যেক যাত্রীর তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটত সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ফলে যাত্রীদের এক বিরাট অংশ হয়ত বেঁচে যেতে পারত। আগেই বলা হয়েছে, যে কোন জাহাজ বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা থাকে। পুরোভাগের একটা কিংবা দুটো কম্পার্টমেন্ট জলে ভরে গেলে জাহাজটা দৈর্ঘ্য বরাবর হেলে যাবে বটে, কিন্তু তার না ডুবে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। সামনের দুয়েকটা কম্পার্টমেন্ট বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও একই সম্ভাবনা থাকে। এই জাহাজডুবির ফলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের সচেতনতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

মারসীসাহেব সামুদ্রিক দেশগুলোকে একত্র করে সমুদ্রের মাঝে জাহাজের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা লিপিবদ্ধ করবার প্রস্তাব রেখেছিলেন তাঁর রিপোর্টে। সেই সময়ে এ ব্যাপারে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে ওঠেনি। বলতে গেলে তিনিই প্রথম তার বীজ রোপন করলেন। টাইটানিকের ট্রাজেডি পৃথিবীর সমস্ত জাহাজ কারবারকারীকে যথেষ্ট সচেতন করে তুলেছিল। তাই সামুদ্রিক দেশগুলোর একজোট হতে বেশী সময় লাগেনি। প্রথম যে বৈঠক বসেছিল তাতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো সুপারিশগুলো নিজ নিজ দেশে কার্যকর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হল। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের নাম SOLAS (Safety Of Life At Sea)। তারপর থেকে কয়েক বছর পর পর এই সম্মেলন হয়ে চলেছে। সেইমত আইনের অনুচ্ছেদগুলো পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত বা পরিমার্জিত হচ্ছে।

আজ এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা অনেক উন্নত। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলেই এটি সম্ভব হচ্ছে। বরফের অবস্থিতি চীন সাগরের টাইফুন বা ভারতীয় মহাসমুদ্রের উপর ঘূর্ণীঝড়ের আভাস পাওয়া গেলেই ওই এলাকার সমস্ত জাহাজকে তক্ষুনি খবরটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জাহাজের ভেতর আবহাওয়া সংক্রান্ত অনেক কিছু পরিমাপ করবার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও আছে। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে তুষারসংক্রান্ত খবরাখবর সংগ্রহের জন্য জাহাজ বা উড়োজাহাজ ক্রমাগত পরিক্রমা করে চলেছে। আজ জাহাজে জরুরী অবস্থার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেক যাত্রীর স্থানসঙ্কুলানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে লাইফবোট থাকে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আজ তাকে গতিনিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় যাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়, সেজন্য যথাযথ আলোর সুবন্দোবস্তের উপর নজর দেওয়া হয়। আরও বহু আইনসিদ্ধ বিধিনিষেধ আজ বলবৎ রয়েছে। তাই শুধু জাহাজ তৈরীর সময়ই না, জাহাজ চালু

হয়ে যাবার পরও প্রতি বছর নিয়ম করে নিরাপত্তার বিভিন্ন ব্যবস্থা, যেমন জাহাজের কাঠামো, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অগ্নিনিবারণের বিভিন্ন সরঞ্জাম, জীবনরক্ষা ব্যবস্থা সরেজমিনে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিটি জাহাজকে তা মেনে চলতে বাধ্য করা হয়।

আইন করে সর্তকতা অবলম্বন করা মানে এই নয় যে পৃথিবীতে জাহাজ আর ডুববে না বা জাহাজ ডুবে গেলেও সমুদ্রে কোন যাত্রীর প্রাণহানি হবে না। সাগরে যাত্রাপথে তেমন ঝঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ পরিস্থিতিতে কোন কোন হতভাগ্য জাহাজ আপ্রাণ চেষ্টা করেও ডুবে যাবার হাত থেকে রক্ষা নাও পেতে পারে। লাইফবোট, লাইফরাফ্ট ও লাইফবেল্টের সবরকম উত্তম সুবিধে থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ভাগ্যহীন যাত্রীর জীবনরক্ষা সম্ভবপর নাও হতে পারে। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলায় জাহাজডুবি বা প্রাণহানির হার আগের চেয়ে অনেক কমেছে এবং ভবিষ্যতে যে আরও কমবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

টাইটানিকের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার আরও কিছু খবর পাওয়া গেছে। সাগরতলে তার ঠিকানা জানার জন্য প্রয়াস চালানো হচ্ছিল সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে। পাঁচ বছর অনুসন্ধান করার পর অবশেষে সাফল্য মিলল 1985 সালের পয়লা সেপ্টেম্বর। টাইটানিকের বয়লারের ছবি ভেসে উঠল গবেষণা জাহাজ নরের (Knorr) ভিডিও পর্দায়। এই জাহাজ জলের তলায় চলন্ত ডুবোযান (Submersible) আরগোকে (Argo) জলের প্রায় দু মাইল নিচ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আরগোর সাথে ছিল ভিডিও ক্যামেরা যা জলের গভীরের ছবি তুলে চলছিল, আর তা প্রতিফলিত হচ্ছিল ভাসমান জাহাজ নরের ভিডিও পর্দাতে। বয়লারের ছবি দেখে জাহাজকর্মীরা সচেতন হয়ে উঠল। টাইটানিকের বিভিন্ন অংশের আলোকচিত্র তাদের কাছে ছিল। ছবি মিলিয়ে তাকে চিনে নিতে ভুল হল না। খবরটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় নিল না।

চারিদিকে চাঞ্চল্য জেগে উঠল। সকলেই উৎসুক টাইটানিকের বর্তমান অবস্থা জানতে। ভিডিও ছবিতে দেখা গেল যে পেছনকার চওড়া বরাবর ভেঙে গিয়ে জাহাজটা দুভাগ হয়ে গেছে, যদিও জাহাজডুবির মুহূর্তে পুরো জাহাজটাই ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হচ্ছিল। হিমবাহের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় তার মাস্তুল ইত্যাদি ভেঙে গিয়েছিল। এই 75 বছরের বেশি সময় ধরে তার আর কি ক্ষতি হয়েছে সে সবের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য সকলে আগ্রহী হয়ে উঠল। জাহাজের প্রথম যাত্রাতেই শেষের বাঁশি বেজেছিল, তাই তার সবকিছুই ছিল নতুন। তারপর জলের যে গভীরতায় জাহাজটি এখন

রয়েছে তার তাপমাত্রা খুবই কম। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তার গায়ে কতটা মরচে ধরেছে তা জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল অনেকে।

টাইটানিক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের (Titanic Historical Society) সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। জাহাজের যে কোন জিনিস স্মৃতি হিসেবে ফিরে পেতে তাঁরা উদগ্রীব। আর কোনমতে যদি টাইটানিকের ঘন্টা দুটোর মধ্যে একটা উদ্ধার করা যায়, তবে তো সোনায় সোহাগা! প্রাণিতত্ত্ববিদেরা এখন থেকেই চিন্তা করতে শুরু করেছেন সাগরে এহেন মোলায়েম বাসস্থান পেয়ে কি কি প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে ওই গভীরতায়। ভিডিও পর্দায় বিরাট মাছের ছবি ফুটে উঠেছিল। এতদিনে এদের ক' পুরুষের বাস সেখানে হয়ে গেল কে জানে!

টাইটানিককে উঠিয়ে আনা যাবে কি না এ প্রশ্ন ক্রমশঃ বড় হয়ে দেখা দিল। এর উদ্ধারের জন্য লাগবে বিপুল পরিমাণে অর্থ। টাইটানিক থেকে যে সম্পদ মিলবে তা তো এর তুলনায় কিছুই নয়। সেখানে সোনাদানা যে একেবারে পাওয়া যাবেনা তা নয়। বিভিন্ন বিবরণে জানা যায় যে জাহাজের জমা রাখার কক্ষে এক যাত্রী গচ্ছিত রেখেছিলেন তাঁর 11000 ডলারের নেকলেশ, আর একজন যাত্রীর 50000 ডলার মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা ও সোনার বাট বক্ষিত ছিল। এক বিরাট সংখ্যক যাত্রী তো বরাবরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিচ্ছিল—তারা নিশ্চয় কিছু সোনা ও হীরে সঙ্গে রেখেছিল। তবু এদের সম্মিলিত মূল্য জাহাজ তোলার খরচার তুলনায় খুবই নগণ্য। তাই টাইটানিককে ঐতিহাসিক মূল্যের চেয়ে বেশি কিছু দিতে অনেকেই অপারগ। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আংশিক অর্থ দিতে রাজি থাকলেও, এর পুরো খরচ বহন করতে এখন কেউ এগিয়ে আসেনি।

তবে অনেকেরই বিশ্বাস, টাইটানিক তোলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ একদিন ঠিকই সংগৃহীত হয়ে যাবে। তাই কিভাবে এই দুরূহ কার্য সমাধা করা যায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে। জলের এই বিশাল গভীরতাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এখনও পর্যন্ত জলের সবচেয়ে বেশি যে গভীরতা থেকে উদ্ধারকার্য সম্পন্ন হয়েছে তার মাপ 2040 মিটার। – ওই গভীরতা থেকেই, এয়ার ইন্ডিয়ার ভেঙেপড়া বোয়িং বিমান কনিষ্কের ব্লাক বক্স ও ভগ্নাংশ উদ্ধার করা হয়। ডুবোযান জলের তলায় পাঠিয়ে ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাদের যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত হাল্কা ভগ্নাংশ তুলে আনা যায়। আরগোর ভেতরে শুধু ভিডিও ক্যামেরা ছিল, তার যান্ত্রিক হাত ছিল না। অল্প কিছু ডুবোযান আছে যারা জলের 15000 ফুট গভীরে যেতে পারে। তাই 12000 ফুট গভীরতা থেকে টাইটানিকের কিছু কিছু টুকরো উদ্ধারের কথা ভাবা গেলেও, তার

আর ক্ষতি সাধিত না করে কিভাবে পুরোটা উঠিয়ে আনা সম্ভব হবে, এটা এখনও ঠিক কল্পনা করা যাচ্ছে না।

সামুদ্রিক উদ্ধার বিশেষজ্ঞ ডিক ফ্রেডরিকসের দরবারে টাইটানিক উত্তোলনে আগ্রহী এহেন অনেকে হাজির হলেন। তিনি এ ব্যাপারে কিছু চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং তার পরিকল্পনার কথা কিছু কিছু জানিয়েছেন। তিনি এই উদ্ধারকার্য সংঘটিত করতে চান একটা অর্ধভাসমান (Semi-Submersible) জাহাজের সহায়তায়। এর



প্লেট নং 7.1 ঃ টাইটানিকের সাগরতল থেকে তোলার অন্যতম পরিকল্পনা

ডুবন্ত খোলগুলোতে প্রচুর পরিমাণ জল মজুত রাখার ব্যবস্থা থাকবে। উত্তোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্ধভাসমানের কাত হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে, নিমজ্জিত খোল দুটিতে জলের প্রবেশ বা নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা কম্পিউটার দ্বার নিয়ন্ত্রিত হবে। এই যান থেকে বিশেষ মজবুত তার টাইটানিকের সঙ্গে যুক্ত হবে। তারপর ডেকে অবস্থিত উইঞ্চের সাহায্যে টাইটানিককে উঠিয়ে নিয়ে আনা হবে। অগভীর জলে যখন টাইটানিককে নিয়ে আসা সম্ভব হবে, তখন ডুবরি নামিয়ে টাইটানিকের খোলের ছিদ্র বন্ধ করে বা অন্য কোন উপায়ে তাকে ভাসিয়ে তোলা। ফ্রেডরিকসের অনুমান এ ব্যাপারে সময় লাগবে পাঁচ বছর এবং এতে খরচ হবে বেশ কয়েক শ' কোটি ডলার। টাইটানিক দ্বিবিভক্ত হবার জন্য একই প্রক্রিয়ায় দুবারে জাহাজটি তুলতে হবে।

ক্যানাডার নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের তীর থেকে 350 মাইল দক্ষিণপূর্বে সাগরের তলায় টাইটানিক বসে আছে। 1986 সালের বিভিন্ন সময়ে জাহাজের বাইরের প্রতিটি অংশেরই ছবি তোলা হয়েছে। জাহাজের সামনের দিক সাগরগর্ভের ভেতর ঢুকে আছে। খুব সম্ভবতঃ ডুবে যাবার সময় সামনের দিক কিছুটা হেলে গিয়েছিল। যখন জাহাজ সমুদ্রের তল স্পর্শ করে তখন তার গতি ঘন্টায় 30 মাইল বা তার বেশি ছিল।

টাইটানিকের ছবিগুলো দেখলে তার বর্তমান অবস্থার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। কেবলমাত্র ভেঙে যে দুটুকরো হয়ে গেছে তাই নয়, জাহাজের প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই 79 বছরে। সামনের দিকটা তুবড়ে ও মুচড়ে গেছে, পেছনের দিকটা প্রায় বিধ্বস্ত বললেই চলে। জাহাজের সেই রাজকীয় সৌন্দর্যের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। লোহার সমস্ত অংশেই প্রচন্ডভাবে মরচে ধরে গেছে। মোমবাতি জ্বললে মোম যেমন গলে গলে পড়ে, জাহাজের অনেক অংশেই লোহা মরচে ধরে সেরকম ঝুলে পড়েছে। জাহাজে কাঠ যা ছিল তা প্রায় সবই পোকায় কেটে দিয়েছে।

জাহাজের পিছনের দিকে অনেক জিনিস ও ভাঙা টুকরো অংশ সাগর গর্ভে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের মধ্যে আছে চীনেমাটির কয়েক শ' কাপ। তাদের অধিকাংশই আবার অক্ষত অবস্থায় হোয়াইট স্টার লাইনারের সাদা তারার ছাপ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে বা শুয়ে আছে। জলের তলায় পড়ে থাকা অসংখ্য ইলেকট্রিক হিটার ঠান্ডার দিনে জাহাজের কেবিনে আরামের ব্যবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়। একটা চীনেমাটির স্নানের টাব (tub) পাশের লোহা থেকে মরচে উপছে পড়ে ঢেকে গেছে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আছে একটা শ্যাম্পেনের বোতল, তোবড়ানো রূপোর বাটি, ডেকের বেঞ্চের একটা ফ্রেম, ভীষণভাবে মরচে ধরা লোহার স্তম্ভ, কাঠের

সিঁড়ির ধাপ ইত্যাদি। একটি পুতুলের ছিন্ন মস্তক ও রোমান দেবী ডায়নার একটি অক্ষত মূর্তিও দেখতে পাওয়া গেছে।

অনেকের মনে কিন্তু প্রশ্ন জেগেছে টাইটানিক কি করে দুভাগ হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবধি বহু জাহাজ ভাসমান অবস্থাতেই দ্বিবিভক্ত হয়ে যেতে দেখা গেছে। তখনকার দিনের ইস্পাত দিয়ে তৈরি জাহাজের এহেন ভেঙে যাওয়াকে পলক ভাঙা (brittle fracture) বলে। জলের তলায় অল্প তাপমাত্রায় টাইটানিকের ভাগ্যে কি তাই ঘটেছিল ? কেউ কেউ বলেছেন যে টাইটানিক ডুবে গিয়ে সাগরের তলায় এক পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিল। তারপর সমুদ্রের তলায় ভূমিকম্প হওয়ায় সে উপত্যকায় উৎপাটিত হয়ে দুভাগ হয়ে গেছে। আর একদল বিশেষজ্ঞের মতে টাইটানিকের সামনের দিকের কম্পার্টমেন্টগুলো ফুটো হয়ে ভারী হয়ে যাবার ফলে পেছনের দিকের অপেক্ষাকৃত হাল্কা অংশের সঙ্গে ভার বৈষম্যের ফলে সমুদ্রগর্ভে পতনের মুহূর্তে তা দ্বিবিভক্ত হয়ে গেছে।

টাইটানিকের বর্তমান যা অবস্থা তাতে তাকে বোধহয় আর ওঠানো সম্ভব নয়। সমুদ্রের তলায় সে যেমন বহু বছর আছে, বাদবাকি জীবন তার তেমনি কেটে যাবে, তবে প্রশ্ন থেকে যায়, সমুদ্রের অরক্ষিত অবস্থায় যখন তাকে পাওয়া গেছে, তখন কি তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হবে !

৮

সমুদ্রের অধিকার

জনসংখ্যার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, স্থলভাগের সম্পদের ক্রমশ হ্রাস মানুষকে চিন্তান্বিত করে তুলেছে। কিছু কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য তো আর কয়েক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই সম্পদের খোঁজে তাকে হাত বাড়াতে হচ্ছে স্থলের বাইরে। পৃথিবীর শতকরা 71 ভাগ জল। সেখানে নানারকম সম্পদ এখনও আহরণের অপেক্ষায় দিন গুণছে। নিজের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ গত কয়েক দশক ধরে সেই রত্নাকরের গভীরে সম্পদ অন্বেষণে নিয়োজিত। কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্যও মিলেছে। মানুষ আজ প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মাধ্যমে সে সম্পদ উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে ও তার পরিমার্জনে ব্যস্ত। কেননা আগামী দিনের মানুষকে অনেক বেশি নির্ভরশীল হতে হবে সমুদ্রের উপর।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে সমুদ্রের গভীর থেকে বিভিন্ন বস্তু আহরণে কোন দেশের অধিকার বর্তাবে। এ ব্যাপারে সমগ্র পৃথিবীর চিন্তাভাবনা, বিভিন্ন দেশের নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রস্তাব, তার সাফল্য ও ব্যর্থতা, এই সব ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সমুদ্রের সম্পদকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (1) শক্তি উৎপাদনকারী সম্পদ, (2) প্রাণিজ সম্পদ এবং (3) মণিকসম্পদ। মানুষকে শক্তি যোগান দেওয়ার বিভিন্ন উপাদান সাগরের জলে লভ্য। সাগরের জলে যে পরিমাণে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম আছে তা 600 কোটি লোকের প্রতিজনের প্রতিদিন 5 কিলোওয়াট হিসেবে আগামী সাত লক্ষ বছর পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, অবশ্য যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাদের পাওয়া সম্ভব হয়। সাগরতল থেকে জ্বালানি তেল প্রাকৃতিক গ্যাস সংগ্রহে মানুষের প্রচেষ্টার আজ চার দশক পূর্ণ হতে চলল। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু না হলেও সাগর থেকে আরও কিছু উপায়ে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলছে। এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) প্রকল্প যেখানে সাগরের জলের তাপের তারতম্যকে কাজে লাগিয়ে

তাপশক্তিকে প্রথমে যান্ত্রিক শক্তি ও পরে তা বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াস চলছে। সমুদ্রের তরঙ্গের ভেতর যে শক্তি নিহিত আছে, তার থেকে নানান প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক শক্তিলাভ করার পরিকল্পনা আজ গবেষণাস্তরে সীমিত। জোয়ার-ভাঁটার স্রোতপ্রবাহকে শক্তিতে পরিবর্তিত করার প্রচেষ্টায় অবশ্য কিছু কিছু সাফল্য মিলেছে।

মানবজাতিকে প্রাণিজ সম্পদ সরবরাহে সমুদ্র এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। পৃথিবীর জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে যেখানে প্রকটভাবে প্রোটিনের অভাব দেখা যায়, সেখানে সামুদ্রিক প্রাণী যে এই অভাব মেটাতে কার্য্যকরী ভূমিকা নিতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমুদ্রে যত শ্রেণীর প্রাণী বর্তমান তার শতকরা মাত্র দুভাগ মানুষের কাজে লাগে। বাদবাকি শতকরা 98 ভাগ সমুদ্রে জন্মে সেখানেই বিলীন হয়ে যায়। এদের কাজে লাগাবার প্রয়াসে এখনও সাফল্যলাভ করা যায়নি। গত চার দশকে যে অনুপাতে পৃথিবীতে জন্মহার বেড়েছে, সমুদ্রে মাছ ধরার হারবৃদ্ধি কিন্তু সে অনুপাতে অনেক বেশি। অভাবজনিত সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি অসম বন্টনের জন্য।

সমুদ্র 'জলমাত্র' এই অর্থে যে জলই তার প্রধান উপাদান। তার ভেতর প্রচুর অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত আছে। এই 'জল' থেকে মানুষ পানীয় জল, লবণ, ব্রোমিন, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি আলাদা করতে পেরেছে। এ ছাড়া একদিকে সমুদ্রের বালি ও নুড়িকে যেমন মানুষ কাজে লাগিয়েছে, সে রকমই চেষ্টা চালিয়েছে সাগরের ভেতর থেকে সোনা ও হীরার মত দ্রব্য সংগ্রহে। তবে এসব প্রচেষ্টাই দেশের তটসন্নিকটে সীমাবদ্ধ। সমুদ্রের গভীরে যে পদার্থ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল বহুধাতবীয় নুড়ি (polymetallic nodules), এদের প্রাপ্তিস্থান সমুদ্রের জলস্তরের 1000 মিটার থেকে 6000 মিটার গভীরে, যেখানে তাপ প্রায় হিমশীতল, চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, আর সে গভীরে প্রাণের স্পন্দন প্রায় অবলুপ্ত। যে সব জায়গায় এদের পাওয়া যায় সেখানে প্রতি মিটারে 5 থেকে 200 টা নুড়ি। এরা সাধারণত কৃষ্ণকায়, গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি। এদের গা মসৃণ, ছিদ্রে ভরা ভেতরটা। কয়েক মিলিমিটার থেকে এদের ব্যাস 150 মিলিমিটার হতে পারে। এক একটা নুড়ির ওজন কয়েক গ্রাম থেকে 600 গ্রাম পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। যে চারটে মূল ধাতু এদের ভেতর থেকে পাওয়া যায়, তারা হল তামা, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ ও নিকেল। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে এই চারটে ধাতুর নুড়ির ভেতরে শতকরা অবস্থানের এক মোটামুটি পরিসংখ্যান ৪.1 সারণিতে দেখানো হয়েছে।

8.1 নম্বর সারণি

বহুধাতবীয় নুড়িতে ধাতুর ওজনের শতাংশ

ধাতু	ভারত মহাসাগর	প্রশান্ত মহাসাগর
তামা	0.19	0.53
কোবাল্ট	0.18	0.35
ম্যাঙ্গানিজ	15.57	14.20
নিকেল	0.44	0.99

সমুদ্রগর্ভে আনুমানিক 3×10^{10} টন বহুধাতবীয় নুড়ি আছে। এর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে, শতকরা পঁচিশ ভাগ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে আর বাদবাকি শতকরা পঁচিশ ভাগের অবস্থান আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে। অবশ্য বহু ধাতবীয় নুড়ির এই হিসেব একান্তই অনুমানসাপেক্ষ। আরও ব্যাপকভাবে জরিপ ও পরীক্ষানিরীক্ষার পর পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসমুদ্রে এর অবস্থিতির চিত্র পাল্টে গেলে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

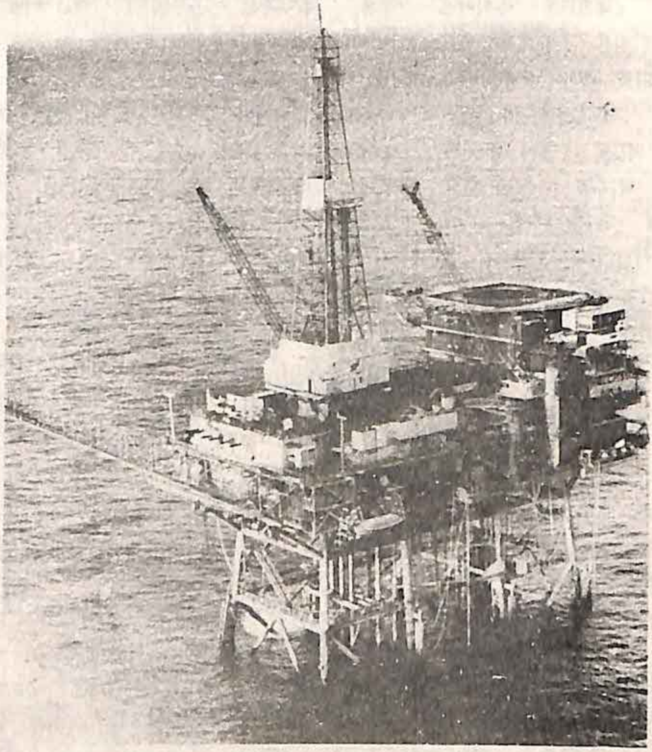
সমুদ্রের সম্পদ আহরণে যে দেশ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করবে, তার মালিকানা যদি সে দেশের উপর বর্তায়, তবে উন্নত দেশগুলোর এ ব্যাপারে সিংহভাগ থাকবে তা বলাই বাহুল্য। তার ফলে ধনী দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হবে এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে সমৃদ্ধির ফারাক দিনদিনই বেড়ে চলবে। পৃথিবীর এক বিরাট অংশের অধিবাসী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করলেও উন্নত দেশগুলোর মত সমুদ্রে তাদেরও অবাধ অধিকার। তাই প্রশ্ন ওঠে সর্বসাধারণের সম্পদ আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায়পুষ্ট দেশগুলোর একা আহরণ ও ভোগ করা কি যথাযথ, ন্যায়সঙ্গত ও আইন দ্বারা সমর্থিত ? উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এই নিয়ে এক আশঙ্কা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। 1958 সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে সমুদ্রসংক্রান্ত যে সভা হয়, তাতে সম্পদ বন্টনের কোন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি। মাল্টাই প্রথম দেশ যে এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাল্টার প্রতিনিধি বলেন, সমুদ্রকে সমগ্র মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, তাই কোন বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রের অধিকার এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তারা প্রস্তাব করে যে সমুদ্রের বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহ থেকে তাকে নানাভাবে কাজে লাগানোর অধিকার সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি হিসেবে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর ন্যস্ত করা হোক এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন প্রবর্তন করা হোক। 1970 সালে সাধারণ পরিষদে সমুদ্রের আইন প্রণয়নের জন্য 1973 সালের মধ্যে এক অধিবেশন আহ্বান করার কথা বলা হয়।

বৈঠক যথারীতি বসে 1973 সালে। মতের আদানপ্রদানে পার হয়ে যায় আরও 93 সপ্তাহ। বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভাববিনিময় চলে, সভার মেজাজ কখনও শান্ত, কখনও উত্তপ্ত। পরস্পরবিরোধী স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আইনের ধারা প্রর্বতন তো আর কুসুম বিছানো শয্যা নয়! অবশেষে 1982 সালের 30 শে এপ্রিল "সমুদ্রের আইনের" খসড়া বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। পক্ষে পড়ে 130 ভোট, বিপক্ষে 4, আর 17টা দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, ইজরাইল ও ভেনেজুয়েলা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। যে 17 টা দেশ নিরপেক্ষ থাকে তাদের মধ্যে আছে ব্রিটেন, স্পেন, ইতালি, পশ্চিম জার্মানি, হল্যাণ্ড, লাক্সেমবার্গ, রাশিয়ার নেতৃত্বে 9 টা সমাজতান্ত্রিক দেশ ও এশিয়া থেকে একমাত্র থাইল্যাণ্ড। সরব সমর্থন আসে মূলত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় সব দেশ থেকেই। এদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল ফ্রান্স, গ্রীস, যুগোশ্লোভিয়া, রোমানিয়া, কানাডা ও ইউরোপের কিছু রাষ্ট্র। সমুদ্রের আইনের খসড়া এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাখা আছে বিভিন্নদেশের আনুষ্ঠানিকভাবে সই করার জন্য। 60 টা দেশের সহ সংগ্রহের ঠিক এক বছর পর তা আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হবে। এই আইন পৃথিবীর সব দেশের সমুদ্রের সব রকমের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করবে।

সমুদ্রের আইনের পাঠ্যাংশ 320 টি অনুচ্ছেদ ও 9 টি পরিশিষ্টে স্ফীত। কুমেরু অঞ্চল এখানে অনুক্ত। এছাড়া সাগরের অন্য প্রায় সব রকমের নিয়ম এখানে লিপিবদ্ধ আছে। সমুদ্র তটবর্তী দেশগুলোর জলসীমার অনুশাসন থেকে গভীর সমুদ্রে সম্পদ উত্তোলন ও তার বন্টনের বিভিন্ন আইনকানুন এতে নথিবদ্ধ। সম্পূর্ণ স্থল পরিবেষ্টিত দেশের স্বার্থও রক্ষা হয়েছে এই আইনে। সমুদ্রের আইনের অতি অল্প কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে দেওয়া হল।

(1) সমুদ্রের তীর থেকে 12 মাইল দূর পর্যন্ত সমুদ্রের সব কিছুর উপর সার্বভৌম অধিকার থাকবে তটবর্তী দেশের। এ অঞ্চলের শুধু জলসীমাই নয়, আকাশপথের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও তাদের এক্তিয়ারে। তবে এই এলাকার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর সব দেশের জাহাজের 'নির্দোষ' যাত্রার অধিকার থাকবে। যাত্রাপথে জলযানের অহেতুক বিলম্ব ঘটলে কিংবা কোন বিশেষ দেশের তরীর উপস্থিতি তটবর্তী দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করলে সেই যাত্রাকে নির্দোষ বলে গণ্য করা যাবে না।

(2) তটবর্তী দেশের সমুদ্রের সম্পদ আহরণের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে তাদের মহীসোপানে (continental shelf)। এর ন্যূনতম সীমারেখা হবে তীর থেকে 200 মাইল, আর উচ্চসীমা 350 মাইল। তীর থেকে এই 200 মাইলের দূরত্ব স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সীমা



প্লেট নম্বর ঃ 8.1 সাগরে তেল উৎপাদনের প্লাটফর্ম

(Exclusive Economic Zone বা সংক্ষেপে EEZ) বলে চিহ্নিত। তবে তীর থেকে 12 মাইল বাদ দিয়ে অন্য এলাকাতে সব রাষ্ট্রের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার থাকবে এবং এখানে সবাই নিজেদের প্রয়োজনমত সমুদ্রতলে তার বা পাইপ সংস্থাপন করতে পারবে। তবে এই সীমারেখায় প্রাণিজ, খনিজ এবং সাগরের সমস্ত রকমের সম্পদ ভোগের একমাত্র অধিকারী হবে তটবর্তী দেশ। কিন্তু তট থেকে 200 ও 350 মাইলের অন্তবর্তী অঞ্চলে সামুদ্রিক সম্পদ উত্তোলনের সার্বভৌম অধিকার তীরের দেশের থাকলেও তাদের আহরিত দ্রব্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে।

(3) তীর থেকে মহীসোপানের শেষ বা 350 মাইল যেটা ন্যূনতম. তার বাইরে যে বিশাল সমুদ্র সেখানে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমা-

অধিকার থাকবে তাকে ব্যবহার ও ভোগ করবার। এই ব্যাপারে বিধিনিষেধ অন্যান্য অনুচ্ছেদে দেওয়া আছে। গভীর সমুদ্রের এই এলাকায় প্রাণী সংরক্ষণে সব দেশ সহযোগিতা করবে।

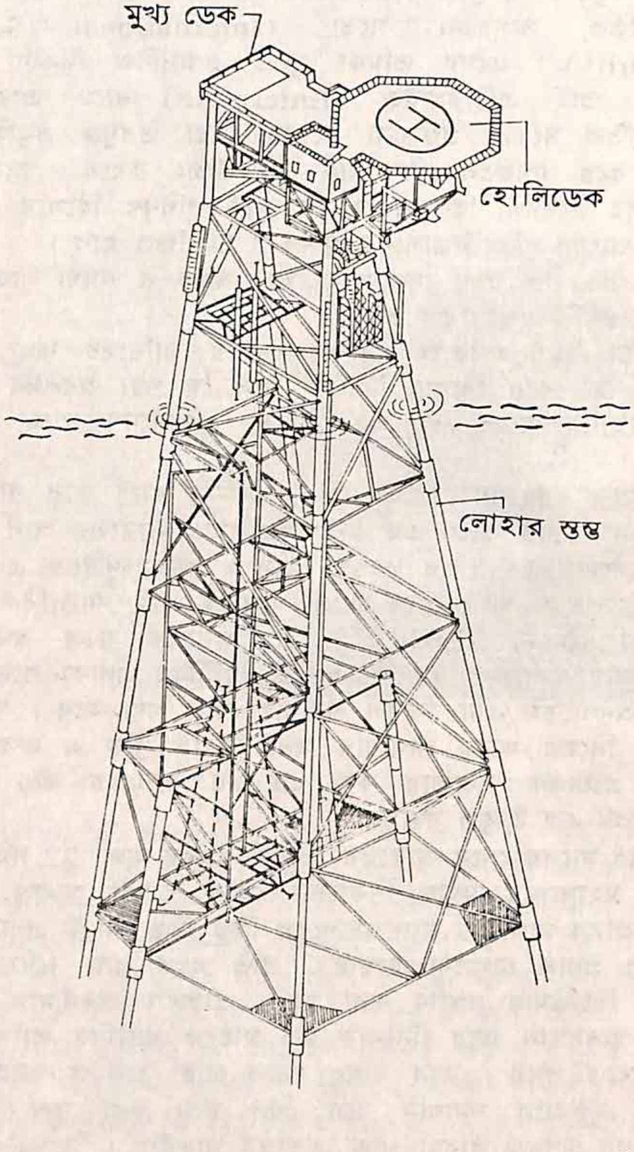
(4) বহুধাতবীয় নুড়ি সংরক্ষণের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবে আন্তর্জাতিক সাগরতল সংস্থা (International Seabed Authority)। এদের ভূমিকা মূলত প্রশাসনিক দিকটা বজায় রাখা। তাই এন্টারপ্রাইজ (Enterprise) নামে আর এক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রস্তাবনা হয়েছে যারা উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে সাগরতল থেকে ওই নুড়ি সংগ্রহ করবে। তবে নুড়ি আহরণের উদ্যোগী হিসেবে যে সব রাষ্ট্র পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তাদের নুড়ি উত্তোলনের অধিকার সংরক্ষিত হবে।

(5) এক দেশ অন্য দেশকে যথাযথ, সঙ্গত ও ন্যায্য শর্তে সমুদ্র সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তরিত করবে।

এছাড়া সমুদ্রদূষণরোধে বিভিন্ন দেশের দায়িত্বের কথা, সমুদ্র সংক্রান্ত যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে যে পন্থা অবলম্বন করতে হবে ইত্যাদি আরও বহু বহু বিষয়ে বিধিনির্দেশ আছে সমুদ্রের আইনে।

"সমুদ্রের আইনের" বিভিন্ন দিক, অন্যান্য রাষ্ট্রে তার প্রতিক্রিয়া আলোচনা করার আগে এর অনুচ্ছেদগুলোতে ভারতের স্বার্থ কতটা রক্ষা পেয়েছে তা দেখে নেওয়া যাক্। আপাতদৃষ্টিতে এ আইন ভারতের পক্ষে সুবিধেজনক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।ছোট ছোট 1280 টা দ্বীপের অধিকারী ভারতের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সীমারেখায় সাগরের 20 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পড়ে। যে কোন অনুপাতেই এটা বিশাল পরিমাপ বলে গণ্য হবে। তাই এ এলাকা নিজের কাজে লাগাবার জন্য বিরাট পুঁজি ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োজন। আশার কথা এই যে ভারতের জন্য রয়েছে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

1985 সালের শেষে ভারতের মৎস্যশিকারের লক্ষ্য 22 লক্ষ টন। ভারত মহাসাগরে মৎস্য শিকারের কোন প্রচেষ্টা আজও হয়নি, যদিও আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের কিছু কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় এ ব্যাপারে প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় 300 কোটি টাকার চিংড়িমাছ রপ্তানি করা হয়। ভারতীয় জলসীমার বিরাট পরিধি অনুসন্ধান করে টিউনার মত মাছকে রপ্তানির তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। তবে সাগর থেকে মাছ তুলে আনলেই সমস্ত কাজের সুষ্ঠুভাবে সমাধান হয়ে গেল মনে করা ভুল। মৎস্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ প্রক্রিয়া, সুস্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থা, উপযুক্ত শীততাপ নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা ও সুবিন্যস্ত চালান-ব্যবস্থা এজাতীয় প্রকল্পের সফল রূপায়ণের অবশ্য অঙ্গ।



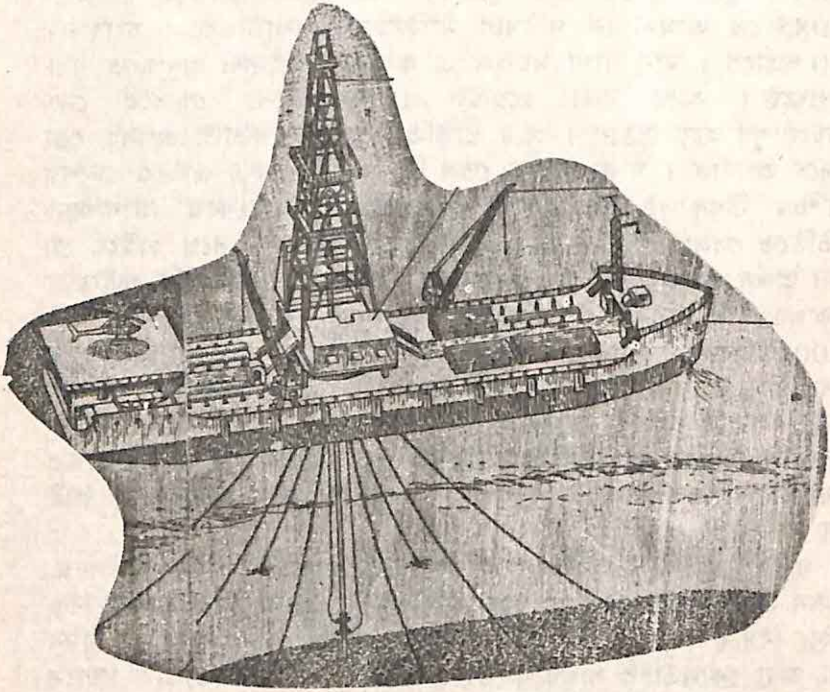
চিত্র নং ঃ 8.1 সাগরে তেল উৎপাদনের প্লাটফর্ম

সাগরতলে তেলের অন্বেষণে ও উৎপাদনে ভারতের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। 1980 সালে দেশের শতকরা 80 ভাগ বিদেশী মুদ্রা ব্যয়িত হত জ্বালানি তেল আমদানিতে। সেক্ষেত্রে 1985 তে আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জ্বালানি তেল চাহিদার 30 শতাংশ। মনে রাখা দরকার এ কবছরে চাহিদাও অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করা হয়েছিল 1990 সালের ভেতরে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। আর প্রাকৃতিক গ্যাসের লভ্যতা এখনই তো দেশে অপর্যাপ্ত। সাগর থেকে তেল উৎপাদনের ক্ষেত্র এখনও দেশের পশ্চিম উপকূলেই সীমাবদ্ধ। গোদাবরী অববাহিকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। অবশ্য বম্বে হাইয়ে যে সব অঞ্চল থেকে তেল উৎপাদন হচ্ছে, সেখানে সাগরগর্ভের গভীরতা কোথাও 90 মিটারের বেশি নয়, সেক্ষেত্রে পূর্ব উপকূলে এই মাপ 200 মিটারের বেশি হতে পারে। তাই বম্বে হাইয়ের প্রযুক্তিবিদ্যার বেশ কিছু রদবদল পূর্ব উপকূলে প্রয়োজন। স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সীমার বহু এলাকায় আজও অনুসন্ধান চালানো হয়নি। তাই পরের দশকে জ্বালানি তেলের আভ্যন্তরীণ চাহিদাই যে মিটবে তাই নয়, ভারত যে খনিজ তেল রপ্তানির দেশগুলোর অন্যতম হয়ে উঠবে না, তাই বা কে বলতে পারে।

গভীর সমুদ্রের সব কিছুতেই সব দেশের যখন সমান অধিকার, তখন একটা প্রতিযোগিতার প্রশ্ন এসে পড়ে। এ ব্যাপারে ভারত কিছু কিছু বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। সাগরের তরঙ্গ থেকে শক্তি উৎপাদন বা অন্য কোনভাবে সাগরকে কাজে লাগিয়ে শক্তির লভ্যতার প্রয়াসে তেমন কোন কার্যকরী প্রকল্প দেশে নেই বটে, তবে সাগর থেকে ধাতব নুড়ি সংগ্রহের কাজে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

"সমুদ্র আইন" প্রণয়নে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উদ্যোগ ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে পারে যে তাদের স্বার্থ পূর্ণাঙ্গভাবে রক্ষিত হয়েছে। তাদের মূলত চারটে উদ্দেশ্য ছিল ঃ (1) সমুদ্র সম্পদের অংশপ্রাপ্তি, (2) সমুদ্রের বিভিন্ন ধাতু প্রাপ্তির ফলে স্থলভাগের লভ্য ধাতুর উপর অর্থনৈতিক চাপসৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা, (3) সমুদ্রতলের খননকার্যে অংশগ্রহণ করা এবং (4) প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তরের একটা ন্যায্য ও যথাযথ নিয়মাবলী রচনা করা। এই আইনের ফলে তাদের স্বার্থ কতটা রক্ষা পেল তা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

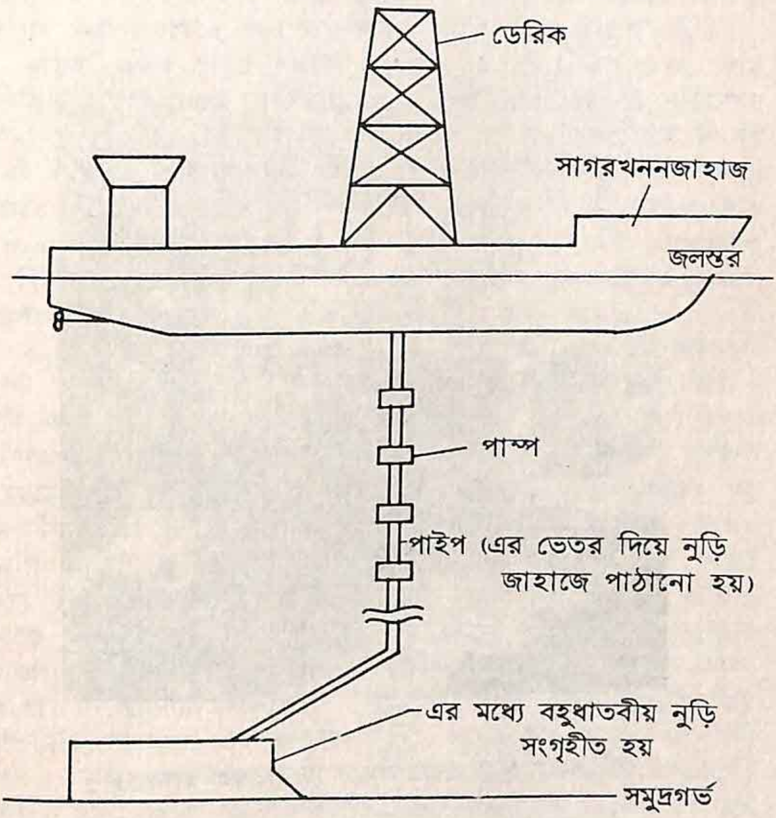
যে কোন দেশের তীর থেকে 12 মাইলের ভেতর অন্য যে কোন দেশের নির্দোষ যাত্রা জলের তলে, জলের উপর বা আকাশপথে —আইনত সিদ্ধ হতে চলেছে। এতে লাভ মূলত উন্নত দেশগুলোর। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উন্নত দেশগুলোর জাহাজই বেশিবার সাগর পাড়ি দেয়। এই আইনের ফলে নৌসেনাদের গতিবিধি আরও মসৃণ



চিত্র নং ঃ 8.2 তেলকূপ খনন করার জাহাজ

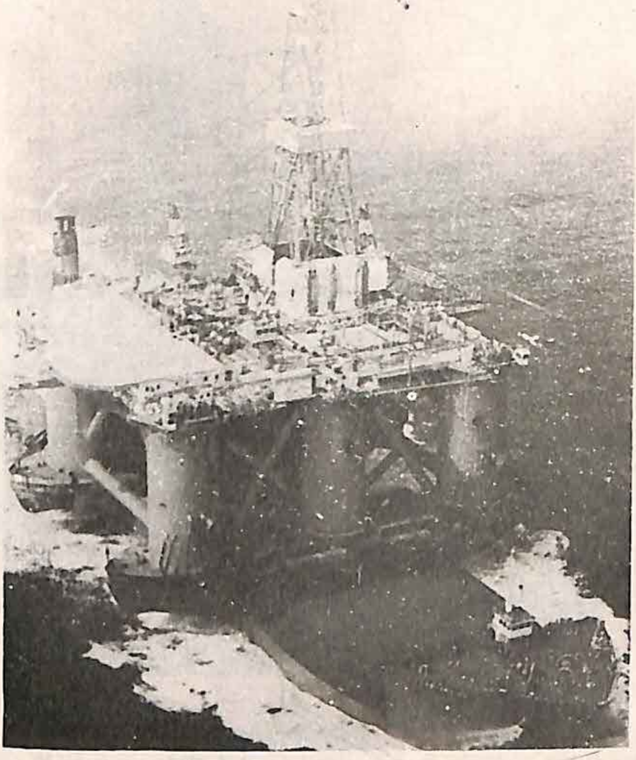
ও যাত্রার সময় হ্রাসপ্রাপ্তির সুযোগ মিলল এবং একটা আইনত স্বীকৃত পরিবেশ সৃষ্টি হল। আর সমুদ্রের মধ্যে বিশাল অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত রণতরী সংস্থাপনের ক্ষমতা কোন উন্নয়নশীল দেশেরই বা আছে! ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রসামগ্রীর শতকরা ৭৪ ভাগ জলপথে সরবরাহ করা হয়েছিল।

স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সীমা 200 মাইল করাতে পৃথিবীর কোন কোন দেশ সুবিধা পেল তা খতিয়ে দেখা যাক্। 24 টা উন্নত তটবর্তী দেশের সম্মিলিত সীমা ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো, চীন ও



চিত্র নং 8.3 ঃ সাগরে বহুধাতবীয় নুড়ি সংগ্রহের পদ্ধতি

ভারতের মত বিশাল তটরেখাবিশিষ্ট দেশ সহ 130 টা উন্নয়নশীল দেশের থেকে অনেকটাই বেশি। মনে রাখতে হবে এই এলাকায় সম্পদ আহরণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও ভোগ করার অধিকার একমাত্র তটবর্তী দেশের। সমগ্র পৃথিবীর স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সীমার যে এলাকা পড়ে তার শতকরা 3.6 ভাগ পড়েছে সবচেয়ে অনুন্নত 28 টি দেশের ভাগ্যে। আর যে 31 টি দেশ একান্তই স্থল পরিবেষ্টিত, অর্থাৎ যার



প্লেট নং ঃ 8.2 অর্ধভাসমান জাহাজের স্থানান্তর

কোন সমুদ্রতট নেই তাদের অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ।

সাগরতল থেকে খনিজ পদার্থ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সংগৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থলভাগে আহরিত খনিজ দ্রব্যগুলোর উপর অর্থনৈতিক চাপসৃষ্টি হবে। নুড়িতে যে চারটে মূল ধাতু পাওয়া যায় তা উৎপাদনকারী দেশে কতটা উৎপাদিত হয় তা 8.2 নং সারনিতে দেওয়া হল। আর কয়েকটা উন্নত দেশের এই ধাতুগুলোর রপ্তানির পরিমাণ 8.3 নং সারনিতে দেখানো হয়েছে। ছকদুটি সুস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত করছে যে উপরোক্ত ধাতুগুলি প্রধানতঃ উৎপাদিত হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের স্থলভাগে এবং উন্নত দেশগুলো একমাত্র রপ্তানির মাধ্যমে তা পাচ্ছে। অতএব সমুদ্রগর্ভ থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নুড়ি আহরণ শুরু হলে উন্নত দেশগুলোর রপ্তানির পরিমাণ কমে যাবে,

এমন কি পর্যাপ্ত পরিমাণে পেলে তা আর রপ্তানি নাও করতে পারে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিদেশী মুদ্রা আয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। "সমুদ্র আইনে" –এর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সাগরতল সংস্থার আয়ের কোন সঠিক উপায়ের নির্দেশ নেই। তাই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোর আশঙ্কা সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে এমন মনে করার সঠিক কোন কারণ নেই।

নুড়ির ভেতর ধাতুর সম্ভাব্য উপস্থিতি ও প্রাপ্তি এক কথা, আর বিভিন্ন জায়গা থেকে তা সংগ্রহ করে বাজারজাত করা ও পরিবেশন করা সম্পূর্ণ অন্য এক কথা। এ ব্যাপারে আইনে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। বর্তমানে স্থলভাগের এই ধাতুগুলোর বাণিজ্যগত কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ভাবে উন্নত দেশগুলোর সম্মিলিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর (multinational) উপরে। তাই নুড়ি থেকে আহরিত ধাতুগুলোর বাণিজ্যিক লেনদেনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যে উন্নত দেশগুলোর দখলে থাকবে, এ আশঙ্কা অমূলক বলে প্রতিপন্ন নাও হতে পারে।

বহুধাতবীয় নুড়ি সমগ্র মানবজাতির কাছে একটা বিরাট সম্পদ। তাই "সমুদ্রের আইনের" বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ একে কেন্দ্র করে। এই আইনের বলে অন্যান্য কয়েকটা উন্নত দেশের সঙ্গে ভারত অন্যতম অগ্রগণ্য বিনিয়োগী (pioneer investor) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। 1983 সালের 1লা জানুয়ারির ভেতর সমুদ্র থেকে বহু ধাতবীয় নুড়ি সংগ্রহের কাজে যে দেশগুলি একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের বেশি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে, তাদের এই বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। এই দেশগুলোকে 15000 বর্গ কিলোমিটার জায়গা থেকে নুড়ি সংগ্রহের অধিকার দেওয়া হবে। তবে আইন অনুসারে তারাও অনুরূপ এক এলাকা এন্টারপ্রাইজকে দেবে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে। অগ্রগণ্য বিনিয়োগী দেশগুলো ছাড়া সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি হিসেবে এন্টারপ্রাইজ নুড়ি আহরণের কাজে উদ্যোগী হবে। নুড়ি বন্টনের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে আইনের পাতায়। 1995 সাল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাজ শুরু হবে। সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি যা এখন কেবল মুষ্টিমেয় উন্নত দেশের দখলে তা এন্টারপ্রাইজ কিভাবে অধিগত করবে, এ নিয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে।

'সমুদ্র আইনে' সামুদ্রিক প্রযুক্তি হস্তান্তর ও নুড়ি সংক্রান্ত আলোচনা পৃথকভাবে করা হয়েছে। যে কোন প্রযুক্তি হস্তান্তরে যে বিভিন্ন দিক আছে তা হল ঃ (1) প্রযুক্তিগত তথ্য বিনিময়। যদি প্রয়োজনীয় তথ্য ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়ে থাকে, তবে তা হস্তান্তর করা। অন্যথায় তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করা; (2) হস্তান্তরিত প্রযুক্তিকে অঙ্গীভূত করার জন্য অনুন্নত দেশের মধ্যে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত ব্যবস্থা সংস্থাপনে সহযোগিতা করা; (3) হস্তান্তরিত প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষাদানের মাধ্যমে অনুন্নত দেশে

8.2 নম্বর সারণি

নুড়ির মূল চারটি ধাতুর লভ্যতা উন্নয়নশীল দেশে

দেশ	পৃথিবীর সংরক্ষণের তুলনায় শতাংশ	পৃথিবীর উৎপাদনের তুলনায় শতাংশ	দেশের বিদেশী মুদ্রা আয়ের তুলনায় শতাংশ
কোবাল্ট			
ফিলিপাইনস্	13	5	–
জায়ার	31	52	21
তামা			
চিলি	23	14	46
পাপুয়া নিউগিনি	3	–	41
পেরু	8	4	19
ফিলিপাইনস্	5	3	10
জায়ার	7	7	43
জাম্বিয়া	8	8	91
ম্যাঙ্গানিজ			
ব্রাজিল	3	9	5
গ্যাবন	6	11	6
ভারত	2	5	–
নিকেল			
কিউবা	6	5	–
কলম্বিয়া	2	–	–
ডোমিনিয়ান সাধারণতন্ত্র	2	3	–
ইন্দোনেশিয়া	13	3	–
ফিলিপাইনস্	10	6	–
আফ্রিকা (দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে)	4	4	–

8.3 নম্বর সারণি

ব্যবহারের তুলনায় রপ্তানির শতাংশ

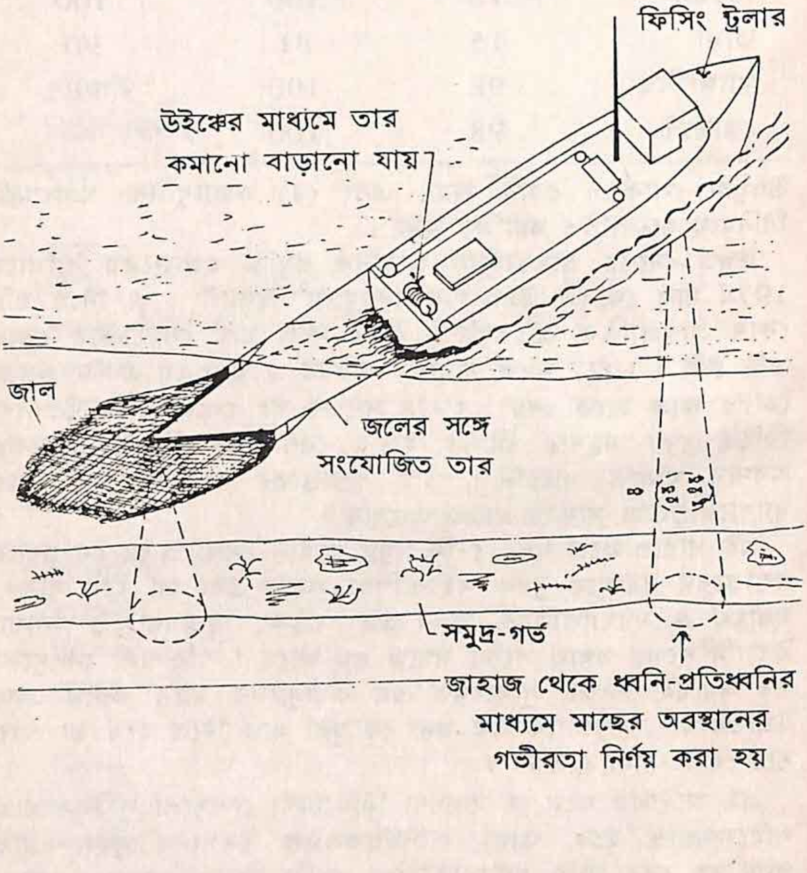
ধাতু	যুক্তরাষ্ট্র	ইউরোপের কমন মার্কেট	জাপান
নিকেল	72	100	100
তামা	15	81	90
ম্যাঙ্গানিজ	98	100	98
কোবাল্ট	98	100	—

উপযুক্ত লোকবল তৈরি করা; এবং (4) অত্যাধুনিক যন্ত্রসামগ্রী বিনিময়ে হস্তান্তরিত ত্বরান্বিত করা।

উন্নত দেশের আয়ত্তাধীনে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যাপারে 1974 সাল থেকেই উন্নয়নশীল দেশগুলো উদ্যোগী। এ নিয়ে যদি কোন আন্তর্জাতিক আচরণবিধি তৈরি করা যায় সে চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। 1977 সালে সাধারণ পরিষদ এ ব্যাপারে একটা খসড়া তৈরির কাজ হাতে নেয়। 1978 সালের পর থেকেই এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ বহুবার মিলিত হয়েও বেশ কিছু বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারেনি। তাই হস্তান্তরের আচরণবিধি তৈরির ব্যাপারে চূড়ান্ত সাফল্য আজও আসেনি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেখি সমুদ্র আইনে লেখা আছে যে প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যাপারে দুপক্ষ সহযোগিতা করবে এবং তা হবে সঠিক, যথাযথ ও ন্যায্যভিত্তিতে, তখন এই 'সঠিক', 'যথাযথ', ও 'ন্যায্য' ইত্যাদি শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। শক্তিশালী দেশগুলো সব সময়েই নিজের সুবিধেমত এই কথাগুলোর মানে করবে এবং উন্নতিকামী দেশগুলোকে এর জন্য যে মূল্য ধরে দিতে হবে তা আর যাই হোক ন্যায্য হবে না।

এই আইনের ফলে যে অগ্রগণ্য বিনিয়োগী দেশগুলো নুড়ি সংগ্রহে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হবে, তারা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করার প্রথম দশ বছর পর্যন্ত এন্টারপ্রাইজকে প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে বাধ্য। এর দুটো দিক অনুধাবনযোগ্য। এক, এন্টারপ্রাইজ নিজে কিভাবে প্রযুক্তি গড়ে তুলবে তার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তাই তাকে উন্নত দেশগুলোর উপর বরাবরই নির্ভরশীল হতে হবে। এতো গেল উৎপাদনের শুরু হবার প্রথম দশ বছরের কথা। তারপর ? প্রযুক্তি কখনোই থিতু হয়ে বসে থাকে না। তার পরিশীলন ও পরিমার্জন নিত্য ঘটে চলেছে। এবং তা অবহিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন গবেষণা



চিত্র নং 8.4 ঃ গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার

ও প্রচুর অর্থ। তাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু হবার প্রথম দশ বছরের মধ্যে নুড়ি তোলার প্রযুক্তি হজম করে এন্টারপ্রাইজ তা আধুনিকতর করায় কিভাবে উপযুক্ত হয়ে উঠবে এ বিষয়ে এক বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, উন্নত দেশগুলো যে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রযুক্তিই হস্তান্তর করবে, সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে করা যেতে পারে। অতএব, এন্টারপ্রাইজ প্রথমেই এক ধাপ পিছিয়ে কাজ শুরু করবে। তাই প্রযুক্তিগত ব্যাপারে মূল হাতিয়ার বরাবরই উন্নত দেশগুলোর হাতেই থেকে যাচ্ছে।

কৌতূহল জাগাতে পারে এত রকমের আশঙ্কার ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও কী কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো এত উৎসাহ ও আগ্রহভরে সমুদ্রের আইন সমর্থন করল, আর সবরকমের চাবিকাঠি নিজের হাতে থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ উন্নত দেশ এর বিরোধিতা করল, না হয় নিরপেক্ষ রইল—কেন ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া থেকে উন্নত দেশগুলোর মনোভাব কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন অধিবেশনে বহু আলোচনায় কার্যকর ভূমিকা নিলেও, তারা শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের আইনের খসড়ার বিরোধিতা করেছে। সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের মনে এ ব্যাপারে যথেষ্ট তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় সবরকম প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগণ্য দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নুড়ি সংগ্রহের প্রযুক্তিতে তারা যে শুধু পুরোধা তাই নয়, অনেক অগ্রসরও তাদের অর্জিত জ্ঞান। পৃথিবীর অনেক অনুন্নত দেশ যখন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন সমগ্র পৃথিবীবাসীর সঙ্গে সর্বসাধারণের সম্পদ ভাগে তাদের এই নেতিবাচক ভূমিকা যে যথেষ্ট পরিতাপের কারণ, সন্দেহ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা পৃথিবীর মাত্র 6 শতাংশ, আর পৃথিবীর শতকরা 40 ভাগ সম্পদ তারা ভোগ করে। তাই বিশ্বব্যাপী কোন বস্তুর ঘাটতি দেখা দিলে তার অভাব প্রকটভাবে উপলব্ধি করবে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা। গবেষণা ও অর্থব্যয় করে যে প্রযুক্তি তারা অধিগত করেছে, তা তারা আইনের মারফৎ হস্তান্তর করতে একেবারে উৎসাহী নয়। তাদের অর্জিত প্রযুক্তিবিদ্যার বলে আহরিত দ্রব্যকে পৃথিবীবাসীর মধ্যে বণ্টনের ব্যাপারে তারা একই রকম নারাজ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ ব্যাপারে মতের খুব ফারাক নেই সমাজতান্ত্রিক দেশসহ পশ্চিমদুনিয়ার অধিকাংশেরই। নিজের দেশের ভেতর যে তন্ত্রই থাকুক না কেন, অনুন্নত দেশের সঙ্গে সম্পদ বণ্টনে এরা 'স্বার্থতন্ত্রে' বিশ্বাসী। কুমেরু অঞ্চলে উন্নত দেশগুলো এক একটা করে স্টেশন বসিয়েছে। মহাকাশের অধিকাংশ জায়গা তাদের অধিকৃত। হয়ত একই ভাবে সমুদ্রকে নিজের ইচ্ছেমত ভোগ করার বাসনাও তাদের ছিল। যেন কোথা থেকে বাধা হয়ে এসে হাজির হল 'সমুদ্রের আইন'।

উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যায় নিয়ত জর্জরিত। দুর্বল অর্থবল নিয়ে তারা অধিকাংশই উন্নত প্রযুক্তি হস্তগত করাকে একান্ত বিলাস বলে মনে করে। সমুদ্রের আইনে তাদের একেবারে বঞ্চিত না করে সম্পদের কিছুটা অধিকারী হওয়ার স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে আর একটা ব্যাপারে এই দেশগুলোর সুবিধে হয়েছে, তা হল এই আইনের ফলে অন্ততঃ একটা আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম তৈরি হল যার উপর দাঁড়িয়ে দুর্বল দেশগুলো তাদের অধিকারের লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে।

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। 'সমুদ্র আইন' একদিন আইনে পরিণত হবে। আইন না মেনে চললে তাতে শাস্তিদানের ব্যবস্থা নিহিত আছে। শক্তিশালী উন্নত দেশগুলো অভিযুক্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিদান কতটা কার্যকর হবে, তা কিন্তু মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন হিসেবেই থেকে যায়। রাষ্ট্রসংঘের বহু নির্দেশে অমান্য করার বহু নিদর্শনই আছে। সেইজন্য অবাধ্য রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। আর সমুদ্র নিয়ে মাঝে উন্নত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতা বজায় রেখে একের পর এক অন্যায় কাজ করে গেলে সম্মিলিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর কী সাধ্য হবে তাদের রোখার! তাই তো ভাবি, এই বিশাল মহাসমুদ্র ভোগ করার অধিকার কার!

৯

অতল জলের আহবানে

যেদিন মানুষ প্রথম সমুদ্র চিনেছিল সেদিন থেকেই সে সমুদ্রতলের বিভিন্ন দ্রব্য আহরণে লিপ্ত। হাজার হাজার বছর আগেও মানুষ সমুদ্রগর্ভে ডুব দিয়েছে ঝিনুক, প্রবাল, মুক্তা আর স্পঞ্জের সন্ধানে। মানুষের সেসব দুঃসাহসিক অভিযানের কথা লেখা রয়েছে গ্রীক ও রোমের ইতিহাসের পাতায় পাতায়। 332 খৃষ্টাব্দে গ্রীস দেশের সম্রাট আলেকজান্ডার টায়ারের যুদ্ধে জলতলের প্রতিবন্ধকতা ধ্বংস করার জন্য ডুবুরিদের পাঠিয়ে ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ দশক থেকে পারস্য উপসাগর ও মান্নার প্রণালীতে ডুবুরিরা নগ্ন দেহে সমুদ্রতলে নেমে চলেছে। আজও ভারতীয় সমুদ্রসীমায় ডুবুরিরা সামান্য কটিবস্ত্র সম্বল করে মুখমন্ডল কাপড়ে আবৃত করে এবং পদতলের সঙ্গে ভারী পাথর বেঁধে সমুদ্রের গভীরে যায় ঝিনুকের খোঁজে। তাদের হাত ও পায়ের আঙ্গুল চামড়ায় ঢাকা থাকে। জলস্তরের 20 থেকে 30 মিটার গভীরে এরা প্রবেশ করে। এদের এক একবার নিমজ্জিত থাকবার মেয়াদ 50 থেকে 80 সেকেন্ড, যদিও এমন এক আধজন দেখতে পাওয়া যায় যারা 6 মিনিট পর্যন্ত ডুবন্ত অবস্থায় থাকতে পারে। 1913 সালে জর্জিয়াস নামে এক গ্রীক ডুবুরি জলের তলায় নগ্ন দেহে 65 মিটার অবধি প্রবেশ করেছিল যা প্রায় কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এরা দিনে গড়ে 30 বার ডুব দেয়। সাধারণতঃ এরা স্বল্পায়ু হয়।

কিন্তু সমুদ্রের গভীরে, আরও আরও গভীরে যাবার বাসনা মানুষের বরাবরই। সেই সঙ্গে আরও বেশি সময় গভীরে থাকার ইচ্ছাও জাগে মনে। জলের গভীরতায় মূলত তিনটে অসুবিধা দেখা দেয়– এক) শ্বাস নেবার অসুবিধে; দুই) যত গভীরে যাওয়া যায়, জলের চাপ তত বাড়তে থাকে; আর তিন) জলস্তর থেকে কিছু গভীরে প্রবেশ করলে পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থাদির পরিমার্জন ও উন্নয়ন এবং নতুন নতুন পন্থার উদ্ভাবন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

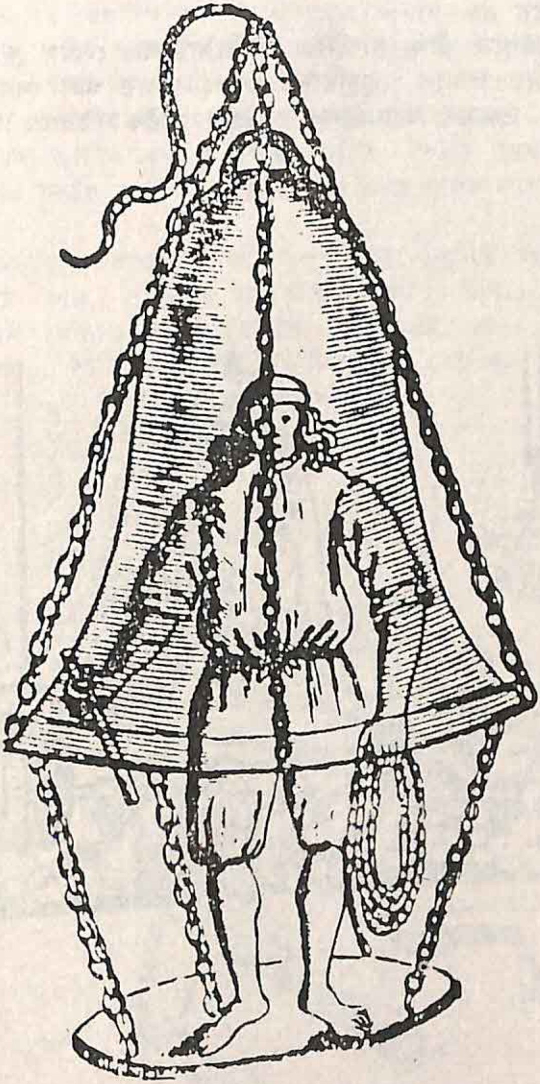
উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে সমুদ্রের গভীরে নামলে মানুষ বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। তাই বিভিন্ন যান্ত্রিক উপায়ে নিজেকে উপযোগী করে তুলতে সে সবসময়ই সচেষ্ট। এই অসহযোগী পরিবেশে সবরকম

সুবিধে সৃষ্টির জন্য প্রযুক্তিবিদ্‌দের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছে। চারিদিকে জল পরিবৃত অবস্থায় ডুবুরিরা কিভাবে শ্বাসকার্য চালানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন পাবে, তা তার অনেক ভাবনার মধ্যে একটা। আর নিঃশ্বাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড যাতে ডুবুরির সরবরাহ বায়ুতে বেশি পরিমাণে মিশে না যায়, তার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। মানুষ বায়ুমন্ডলের চাপের 53 গুণ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে, কিন্তু জলের গভীরে প্রবেশ করলে জলের চাপের মাপে তাকে শ্বাসের হাওয়া যোগানো হয়। জলের ভেতরে তার তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয়। আর যদি অনুসন্ধান বা অন্য কাজে তার অবস্থান দীর্ঘ হয়, তবে তার খাদ্যের প্রয়োজন। স্থলে 24 ঘন্টা ধরে মানুষের শরীরে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে। জলের তলায় দিনরাতের ভেদাভেদ না থাকায় তা ব্যাহত হয়।

জলের ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আর বায়ুমণ্ডল (atmosphere) পরিবেষ্টিত থাকে না। ক্ষণিকের এই অবস্থানে পারিপার্শ্বিক জলের ঘনত্ব তার শরীরের মাপের কাছাকাছি। তাই ত্রিমাত্রিক গতিবিধির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকে এই পরিবেশে, একমাত্র তার চলাফেরার গতিটুকু ব্যাহত হয়। সাধারণতঃ জলের যে গভীরে তারা যায় সেখানকার তাপমাত্রা 5 থেকে 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই নিম্ন তাপ যদি শরীরকে ক্রমাগত সহ্য করতে হয়, তবে যকৃৎ, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও বৃক্কের তাপ কমে যায়। এর ফলে পেশীগুলো ঠিক ঠিক কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাপ বেশি কমে গেলে শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে, ক্ষেত্রবিশেষে সংজ্ঞাহীন হবার আশঙ্কা থাকে। এই অবস্থাকে নিম্নতাপস্থিতি (hypothermia) বলে। তাই ডুবুরির শরীরে তাপমাত্রা যাতে ঠিক থাকে, তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

জলের গভীরে অতিরিক্ত চাপে ডুবুরি যে হাওয়া শ্বাস হিসেবে নেয়, তার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের চাপের অনেক পার্থক্য। তাই যদি কোনো ডুবুরি জলের গভীরে ডুব দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠে আসে, তবে চাপের বিপুল তারতম্যের দরুণ তার চাপস্বাভাবিকরণ পীড়া (decompression sickness) হবার আশঙ্কা থাকে। জলের ভেতর অতিরিক্ত চাপে প্রশ্বাসের অনেক বেশি পরিমাণে হাওয়া রক্তে দ্রবীভূত হয়। গভীর জল থেকে অল্প সময়ে জলের উপরে উঠে এলে শরীর হঠাৎই চাপ মুক্ত হয়ে যায়। তখন অতিরিক্ত হাওয়া বুদ্বুদ আকারে রক্তে ও বিভিন্ন কোষে ছড়িয়ে পড়ে। এই বুদ্বুদের আকৃতি, সংখ্যা ও শরীরের বিশেষ অংশে অবস্থানের উপর বিভিন্ন রোগের উপসর্গ দেখা যায়। অঙ্গ অবশ হয়ে যেতে পারে, শরীর অত্যন্ত দুর্বল লাগতে পারে, বিভিন্ন অঙ্গে বা বক্ষে ব্যথা হতে পারে, শ্বাসপ্রশ্বাসের

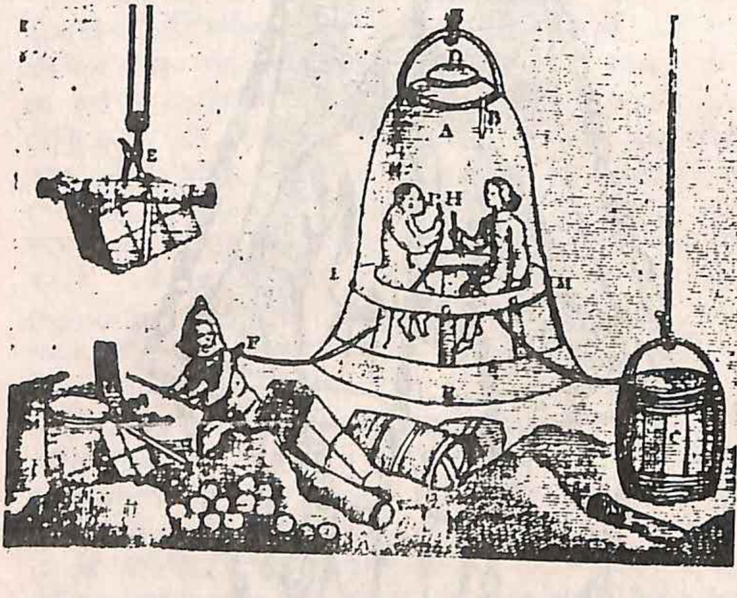
প্রচণ্ড কষ্ট হতে পারে, মাথা ঘোরা ইত্যাদি অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে। খুব কম হলেও গলায় ফুসকুড়ি বা চুলকানি হতে পারে। আর সেরকম মারাত্মকভাবে এ পীড়ায় আক্রান্ত হলে মৃত্যুও হতে পারে। চাপস্বাভাবিকরণ পীড়াই ডুবুরিদের কাছে সবচেয়ে ভয়াবহ। তাই জলের গভীর থেকে ধীরে ধীরে ডুবুরিকে চাপমুক্ত করতে হয়। জলের গভীর থেকে কিছুটা উপরে উঠে সেই স্তরে সে



চিত্র নং 9.1 ঃ ডুবোঘন্টা

কিছুক্ষণ থেমে থাকে। অবশ্য এইভাবে উপরে উঠে আসা বেশ সময়সাপেক্ষ। তাই সমুদ্রের গভীরে কোন ডুবোযানের চাপপূর্ণ কক্ষে পুরে তাকে জলের উপরে উঠিয়ে আনা হয়। সেখান থেকে তাকে জলে ভাসমান জাহাজের চাপপূর্ণ কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপের সঙ্গে সমান করতে সেই কক্ষের ভেতরের চাপ ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয়। ডুবুরি তখন ওই কক্ষ থেকে বাইরে আসতে পারে।

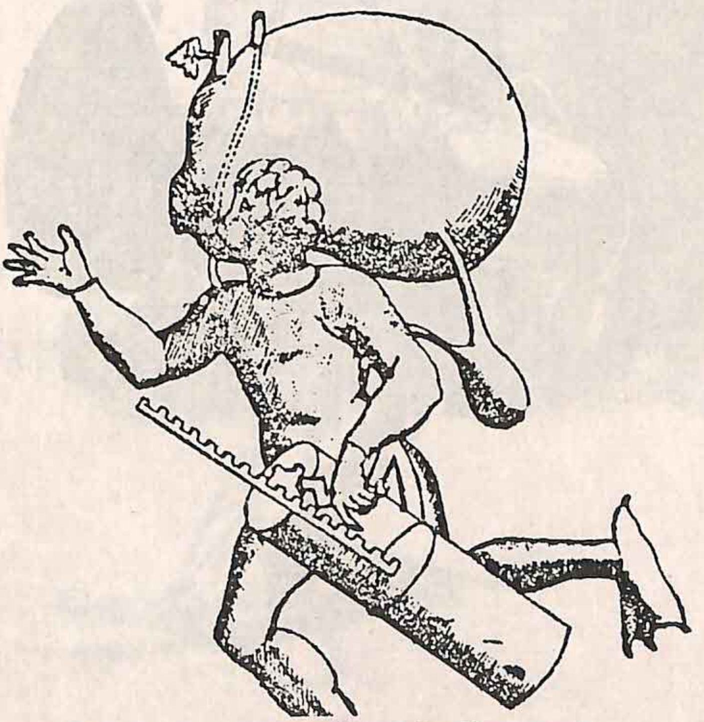
309 খৃষ্টপূর্বে গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টোটলের লেখা থেকে জানা যায় যে তাঁর আমলে ডুবুরিদের জলের তলায় শ্বাস নেবার একটা পন্থা তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। যন্ত্রটা সঠিক কিরকম ছিল তার



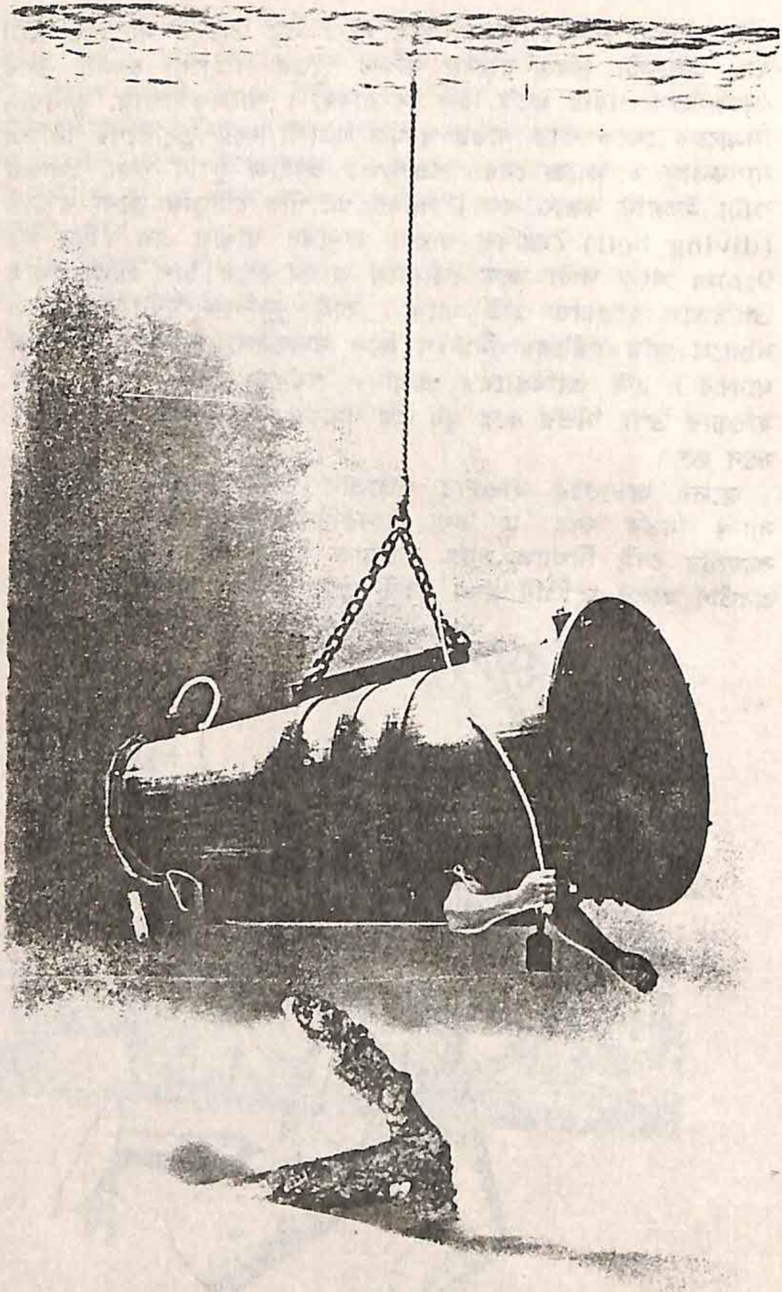
চিত্র নং 9.2 ঃ হ্যালির ডুবো ঘন্টা

বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না । তবু তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, অনেকটা ডুবন্ত হাতির উত্থিত শুঁড়ের সাহায্যে জলের উপর থেকে শ্বাস নেবার মতই ছিল সে ব্যবস্থা । আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজারের থেকে তার পরের কয়েক শতাব্দী ধরে ডুবুরিদের বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজে যেমন শত্রুপক্ষের জাহাজ ফুটো করা, নোঙর কাটা ইত্যাদি করতে হত । সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় ডুবো ঘন্টার (diving bell) বৈপ্লবিক ধারণা মানুষের মাথায় এল (চিত্র নং 9.1) । শংকু ঘন্টা জলে ডোবালে জলের প্রচুর চাপ সত্ত্বেও তার উপরিভাগ হাওয়ায় ভর্তি থাকে । তাই ডুবুরিকে ঘন্টা সহ জলে নামালে তার শরীরের নিম্নাংশ জলে থাকলেও, উপরাংশ হাওয়ায় থাকবে । এই আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে ঘন্টার মধ্যে মজুত হাওয়ার উপর নির্ভর করে খুব অল্প সময়ের জন্য জলের তলায় থাকা সম্ভব হত ।

জলের অভ্যন্তরে হাওয়ার লভ্যতার উপর ডুবুরির অবস্থানের ব্যাপ্তি নির্ভর করে, এ তথ্য অনেকদিনই জানা ছিল । হ্যালির কমেটের সেই বিখ্যাত স্যার এডম্যান্ড হ্যালি এই সময়ে দৃশ্যপটে অবতীর্ণ হলেন । তিনি এমন একটি ডুবো ঘন্টা আবিষ্কার করলেন

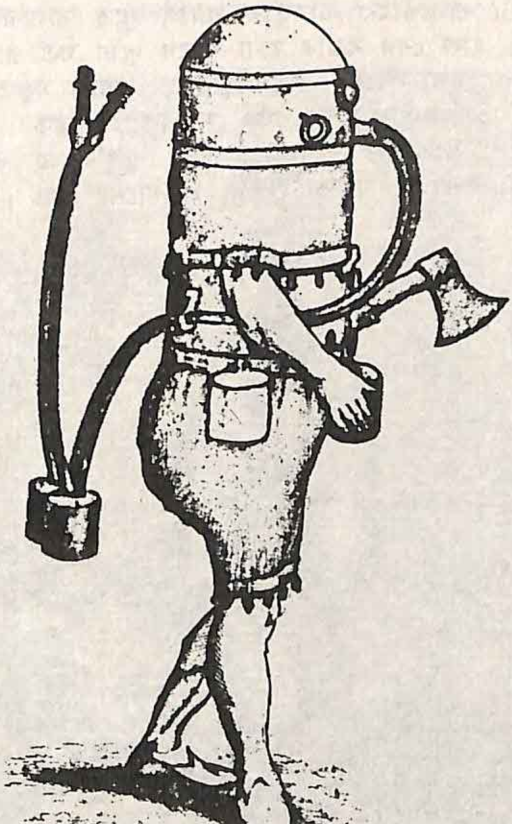


চিত্র নং 9.3 ঃ বোরোলির পরিকল্পিত ডুবুরি



চিত্র নং 9.4 ঃ লেথব্রিজের ডুবুরি

যাতে জলস্তর থেকে তাজা হাওয়া সরবরাহ করা সম্ভব হল এবং এর সাহায্যে ডুবুরিরা জলের তলায় একনাগাড়ে দেড় ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারত বাইরেটা ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। ডুবো ঘন্টার ভেতর হাওয়া পাঠানোর পন্থাই তাঁর আবিষ্কারের মুখ্য বিশেষত্ব। বিরাট হাওয়াভর্তি কাঠের পিপে নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। এই পিপের তলায় একটা ছোট ছেঁদা থাকত । ডুবো ঘন্টা জলের যে গভীরে রয়েছে পিপেটা সেই স্তরে নামিয়ে আনা হত। পিপের সঙ্গে পাইপ দিয়ে তার সংযোগ থাকত। ওই উচ্চ চাপে হাওয়া পিপে থেকে ঘন্টায় চালিত হত। তিনি ডুবুরির একটা পোশাকের নক্সা করেছিলেন যা সর্বাঙ্গে চামড়া পরিবৃত, শুধু মুখোশটা ছিল কাঁচের। এই পোশাক পরিহিত ডুবুরি ঘন্টার বাইরে বেরিয়ে এসে কাজ করতে পারত। ঘন্টার ভেতর থেকে একটা

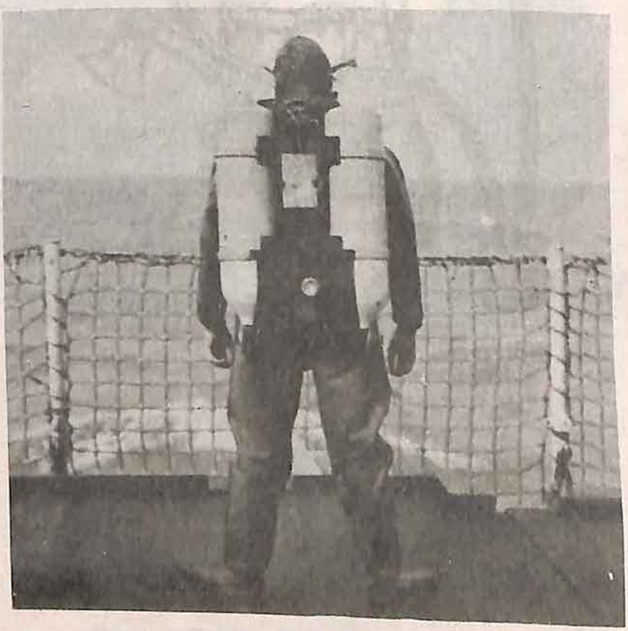


চিত্র নং 9.5 ঃ ক্লাইনগার্ট পরিকল্পিত ডুবুরি

পাইপের সাহায্যে হাওয়া যোগানো হত তাকে। 65 বছর বয়সে হ্যালি নিজের সৃষ্ট ঘন্টায় বসে জলের ৫৫ ফুট গভীরে অনেকক্ষণ অবস্থান করেছিলেন।

হ্যালির আমলেই ইতালীয় সমুদ্রবিজ্ঞানী বোরেলি কম খরচায় একটা ডুবো ঘন্টা তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। এতে তিনি লম্বা এক চামড়ার টিউবের সঙ্গে ডুবুরিকে নিচে পাঠানোর এক পন্থা উদ্ভাবন করলেন। ডুবন্ত অবস্থায় তার মাথা এই টিউবের মধ্যে থাকত। তাঁর উভয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার সময় বিপত্তি উপস্থিত হয়েছিল। মাথাটা টিউবের ভেতরে থাকার দরুণ এক দমবন্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব হল। তাই তাঁর উদ্ভাবিত ডুবো ঘন্টায় অত্যন্ত কম সময়ের জন্য কাজ করা যেত। 1715 সালে জন লেথব্রিজ জলের তলায় উদ্ধারের জন্য এক যন্ত্রের পরিকল্পনা করলেন। ডুবুরিকে একটা জলরোধক চামড়ার ব্যাগে পুরে সাগরের গভীরে পাঠানো হল। হাত বের করার জন্য ব্যাগে দুটো গর্ত রাখা হল। বাইরেটা দেখার জন্য কাঁচের ব্যবস্থা রইল। ব্যাগে মজুত হাওয়ার দৌলতে জলের তলায় আধ ঘন্টা পর্যন্ত সে থাকতে পারত।

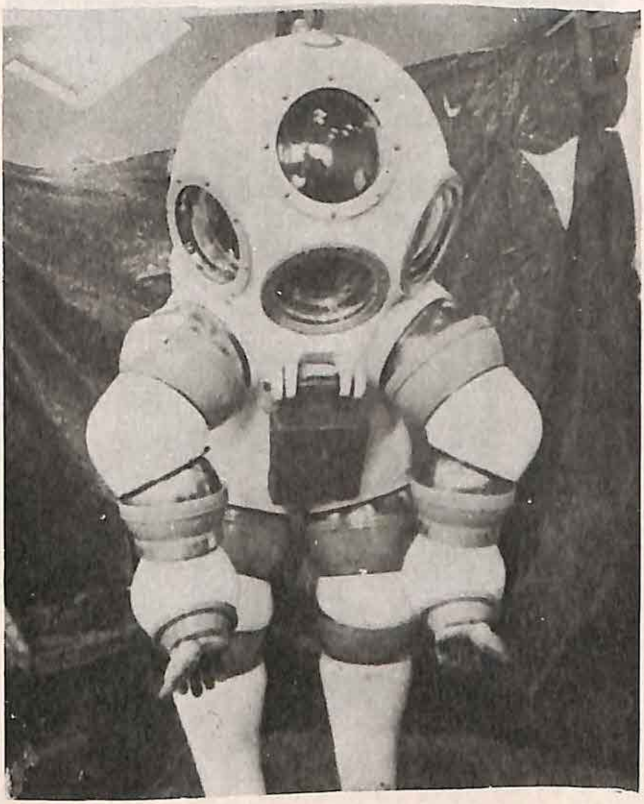
1820 সালে ইংল্যাণ্ডে অগাস্টাস সিব্ ডুবুরিদের এমন এক মুখোশ উদ্ভাবন করলেন যাতে হাওয়া যোগানো যেত। আধুনিক



প্লেট নং 9.1 ঃ স্বয়ংনির্ভর ডুবুরি – পিঠে Scuba

ডুবুরিদের পোশাক তাঁর সেই ধারণার পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ। এইসব সরঞ্জাম দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ এক, যা জলস্তরের উপর হাওয়ানির্ভর, আর দুই যা স্বয়ংনির্ভর।

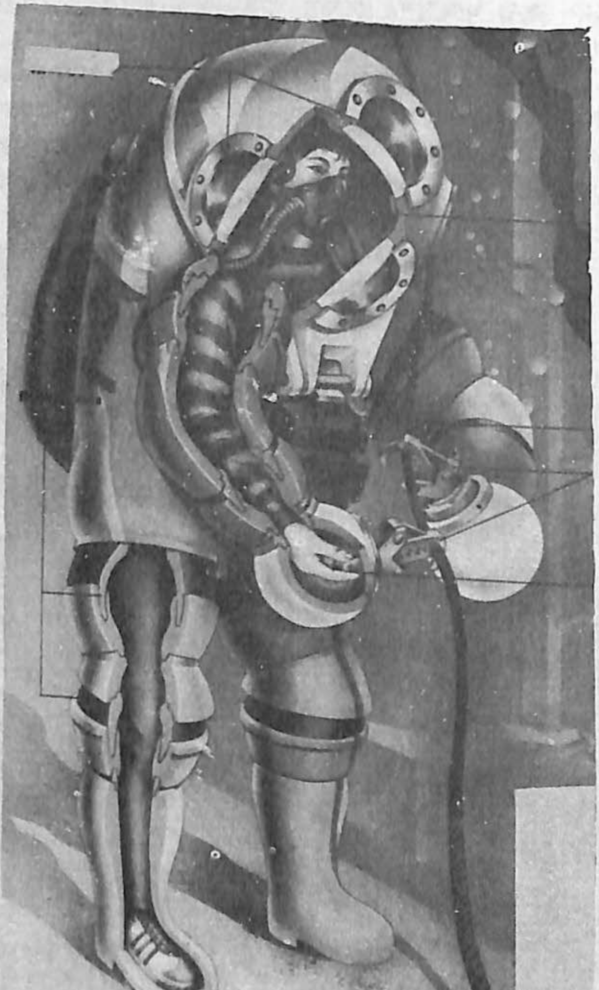
অন্যান্য যে সব পোশাক লভ্য তার মধ্যে আছে একধরনের ডুবুরির পোশাক যা কৃত্রিম রবার নিওপ্রেন (neoprane) দিয়ে তৈরি। তার মুখোশের সঙ্গে ধাতুর বক্ষফলকের (breast plate) সংযোগ থাকে। মুখোশের কাঁচ দিয়ে সে বাইরেটা দেখতে পায়। হাওয়া সরবরাহের জন্য মুখোশের ভেতর পাইপ যুক্ত থাকে। বাইরে জলের যে চাপ সেই চাপেই ডুবুরিকে হাওয়া সরবরাহ করা হয়। জলের প্লবতার জন্য ডুবুরি হাল্কা হয়ে যায়। তাই তার সামনে ও পেছনে ভারী ওজন রাখা থাকে। তাছাড়া সে পায়ে সীসার জুতো পড়ে। এইসব অতিরিক্ত ওজন ধারণ না করলে তার পক্ষে সমুদ্রের গভীরে যাওয়া অসম্ভব হত। ডুবুরির পোশাক জল প্রতিরোধক হতে পারে,



প্লেট নং 9.2 ঃ এই পোষাক পরে ডুবুরি গভীরজলে

যদিও ভিজে পোশাকই তার সহায়ক। ভিজে পোশাকে তার শরীরের ও পোশাকের অন্তর্বর্তী জল গরম হয়ে শরীরকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে।

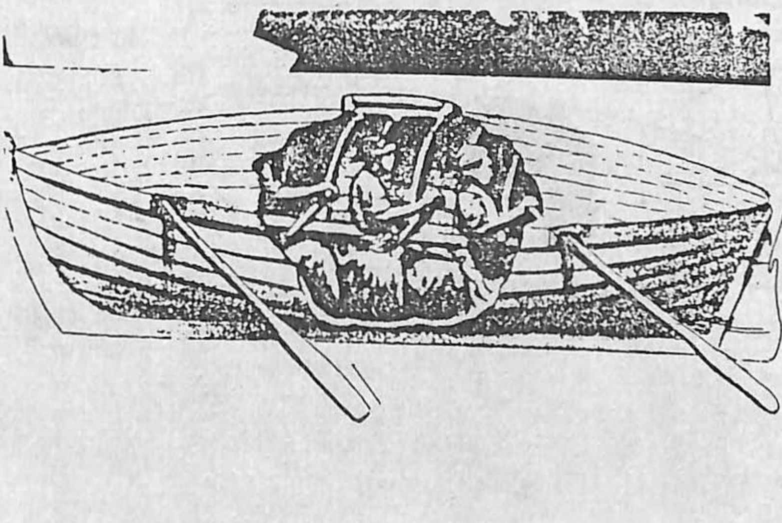
চাপবর্ধনী যন্ত্রের (compressor) সাহায্যে জলের তলায় হাওয়া পাঠানো হয় ডুবুরির কাছে। এই হাওয়ার বিশুদ্ধতা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। উচ্চচাপবিশিষ্ট হাওয়ার সঙ্গে তেল যাতে না চলে যায় তার জন্য ফিল্‌টার (filter) থাকা দরকার। তাছাড়া যন্ত্রের



প্লেট নং 9.3 ঃ শক্ত পোশাক পরিহিত ডুবুরির পোশাকের ভেতরটা

বহির্গামী হাওয়া (exhaust air) যাতে ডুবুরির কাছে পাঠানো হাওয়ার সঙ্গে মিশে না যায়, সেদিকেও সর্বপ্রকার সতর্কতা প্রয়োজন। স্বয়ংনির্ভর সরঞ্জামে (Scuba—self contained underwater breathing apparetus) ডুবুরির পিঠে হাওয়াভর্তি পিপে থাকে। মুখোশের সঙ্গে পিপের পাইপ দিয়ে যোগাযোগ থাকে। জলস্তরের সঙ্গে সংযোগ না থাকাতে ডুবুরির চলাফেরা এক্ষেত্রে অনেক বিস্তৃত।

স্বয়ং নির্ভর ডুবুরির সরঞ্জাম খুব গভীর জলে একেবারেই উপযোগী নয়। তার প্রধান কারণ ওই উচ্চচাপে পিপের ভেতরের হাওয়া কয়েকমিনিটে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাছাড়া গভীর জলে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ডুবুরিকে সাধারণ হাওয়া সরবরাহ করা হয় না। সাধারণ হাওয়া মূলত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ। জলের গভীরতায় চাপের আধিক্যের ফলে নাইট্রোজেন মানুষের মস্তিষ্কের ভেতর ঢুলুনির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর ফলে মাতালের মত উপসর্গ দেখা যায়। তাই সাধারণ হাওয়ার পরিবর্তে জলের গভীরে ডুবুরিকে শ্বাস নেবার জন্য অক্সিজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রণ



চিত্র নং 9.6 ঃ ড্রেবেলের ডুবোজাহাজ

সরবরাহ করা হয়। এর কোন প্রভাব মস্তিষ্কে হয় না বটে, কিন্তু এর ফলে গলার স্বর ডোনাল্ড ডাকের (Donald Duck) মত শুনতে লাগে। অবশ্য জলের তলায় ডুবুরির কথা আর শুনছে কে?

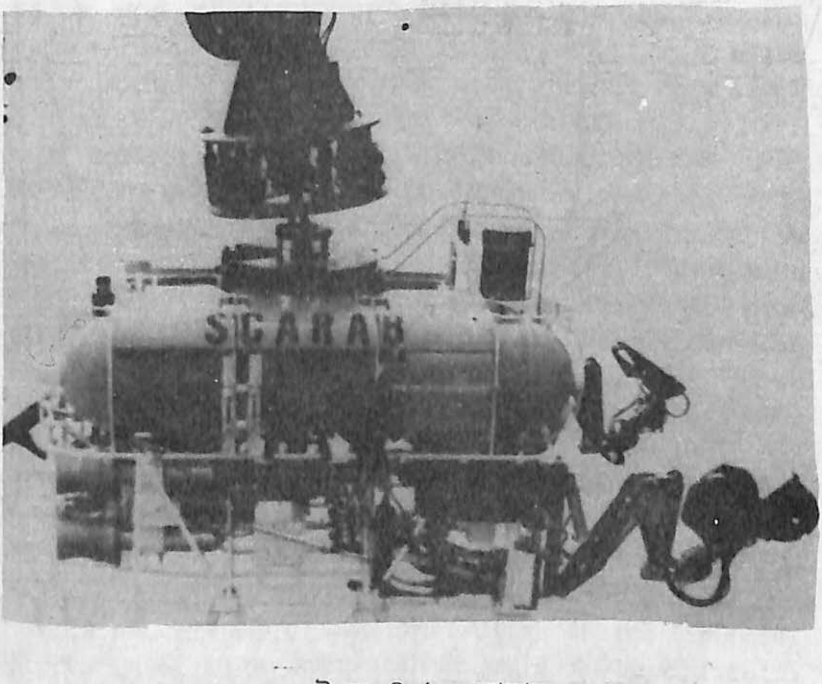
সমুদ্রের তলায় এমন কিছু কাজ আছে যা সম্পন্ন করতে ডুবুরিকে একদিনে হয়ত বেশ কয়েকবার ডুব দিতে হতে পারে। কাজটা সম্পন্ন করতে বেশ কয়েকদিন লাগতে পারে। সমুদ্রের ভেতর তৈল



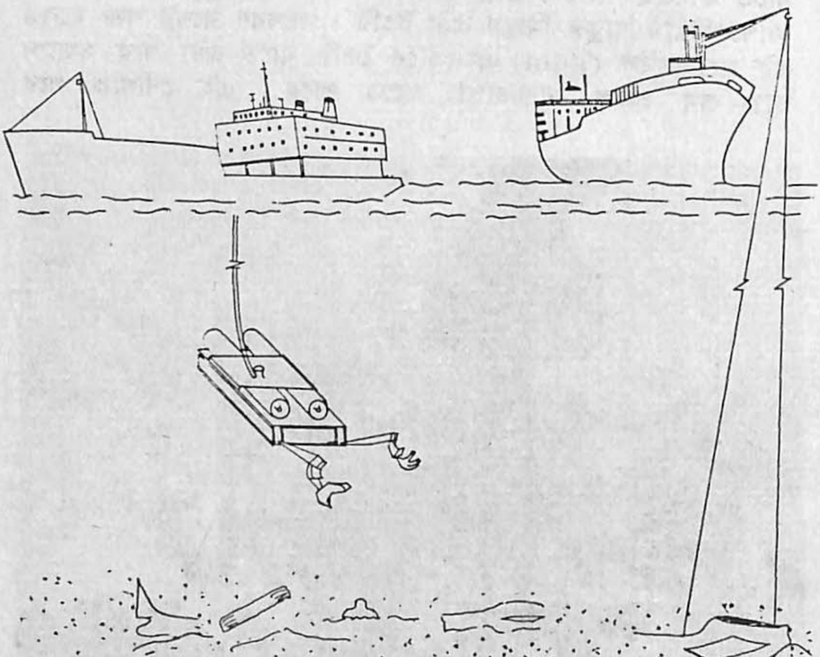
চিত্র নং 9.7 ঃ ডুবোযান

উৎপাদনের জন্য প্রোথিত অবয়বগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডুবুরির প্রয়োজন। তাদের 200 মিটারের বেশি গভীরতায় যেতে হতে পারে। ওই গভীরতা থেকে চাপ মুক্ত হতে সাধারণতঃ বেশ কিছু সময় লাগে। তাই সময় বাঁচানোর জন্য সমুদ্রের গভীরে এক পর্যাপ্ত চাপযুক্ত ডুবোযানে প্রবিষ্ট করানো হয়। ডুবোযান জলের নিচেই রাখা থাকে। প্রত্যেক ডুবের পর ডুবুরি সেখানে আশ্রয় নেয়। এইভাবে তারা এক সপ্তাহ কাল কাজ করতে পারে। অবশ্য কাজ শেষ হলে ডুবোযান করে সে উপরে উঠে আসে। এক্ষেত্রে তাকে পরিপূর্ণ অতিরিক্ত চাপ থেকে মুক্ত করে বায়ুমন্ডলের চাপে ফিরিয়ে আনতে প্রায় সাত দিন লেগে যায়।

রবার জাতীয় পোশাক পরিহিত হয়ে ডুবুরির শরীরকে জলের চাপ সহ্য করতে হয়। ইদানীং একধরনের পোশাক চালু হয়েছে যা পরলে জলের গভীরে ডুবুরির শরীরকে বায়ুমন্ডলের চেয়ে বেশি চাপের মোকাবিলা করতে হয় না। জলের ওই উচ্চ চাপে পোশাক যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, তার জন্য তাকে যথেষ্ট মজবুত করা হয়েছে। ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর মিশ্রণে এটা তৈরি। আবরণ যথেষ্ট শক্ত হলেও এর সংযোগস্থল (joint) এমনভাবে তৈরি যাতে এটা পরে স্বচ্ছন্দে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করতে পারে। এই পোশাক পরে



প্লেট নং 9.4 ঃ স্কারাব



চিত্র নং 9.8 ঃ সাগরতল থেকে উত্তোলন

ডুবুরিরা জলের 500 মিটার গভীরতা পর্যন্ত গিয়েছে।

ডুবুরির পোশাকের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সমুদ্রের জলের ভেতরে কোন শকট চালনার কথা ভেবে আসছিল। চামড়ার যে ব্যাগে আবদ্ধ হয়ে সে সাগরের জলের গভীরে গিয়েছিল, সে তো একরকমের যানই। জলের ভেতর নিমজ্জিত অবস্থায় যে সব শকট পরিক্রমণ করে, তাদের দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়—এক, ডুবোজাহাজ (submarine) এবং দুই, ডুবোযান (submersible)। অবয়ব এবং প্রযুক্তিগত ব্যাপারে এদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও, এদের ব্যবহার ক্ষেত্র ভিন্ন। ডুবোজাহাজ সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নেয় জলযুদ্ধে। একমাত্র বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেই ডুবোযান নিযুক্ত করা হয়। ডুবোজাহাজ নির্মাণের কাজে মানুষ আগে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল, ডুবোযানের পরিকল্পনা তার অনেক পরে। ডুবোযানের ধারণা ডুবোজাহাজ থেকেই এসেছে।

ডুবোজাহাজ তৈরির ক্ষেত্রে সবার আগে ইংরেজ প্রযুক্তিবিদ উইলিয়াম বোর্নের নাম করা যায়। 1578 সালে তাঁর মাথায় যে ধারণা মূর্ত হয়েছিল, তা তিনি বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন কিনা এ ব্যাপারে মতদ্বৈত আছে। ডুবোজাহাজ নির্মাণের প্রথম সঠিক খবর পাওয়া যায় ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের আমলে। এটি প্রস্তুতির পুরো কৃতিত্ব হল্যাণ্ডবাসী কর্নেলিয়াস ভ্যান ড্রেবেলের। এ ব্যাপারে ড্রেবেল নিজেই লিখেছেন যে তিনি এমন একটি জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন যা জলের ভেতরে যথেচ্ছ পরিভ্রমণে সক্ষম ছিল। তাঁর এই যানে চেপে কয়েক মাইল স্বচ্ছন্দে যাওয়া যেত। 1776 সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমেরিকার এক ডুবোজাহাজ ব্রিটিশ রণতরী আক্রমণ করেছিল। এই ডুবোজাহাজটির প্রযুক্তিবিদ্ ছিলেন ডেভিড বুশলেন এবং এর নাম ছিল টার্‌টেল (Turtle)। এটি শত্রু জাহাজের তলায় এসে তাকে ছিদ্র করে তার ভেতর বিস্ফোরক স্থাপন করার ক্ষমতা রাখত। যুদ্ধে ডেভিড বুশলেন ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি যে তাদের রণতরীগুলির মারাত্মক ক্ষতিসাধনের প্রধান কান্ডারী, তা ব্রিটিশাররা বুঝতে পারেনি। তাই একজন সাধারণ গ্রাম্য লোক ভেবে তাঁকে খালাস করে দেওয়া হয়। এরপর ইউরোপের অন্যান্য দেশ ধীরে ধীরে ডুবোজাহাজ নির্মাণ শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি আধুনিক ডুবোজাহাজ নির্মাণের কলাকৌশল পৃথিবীর অনেক দেশেরই জানা হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ডুবোজাহাজের উত্তম ব্যবহারের জন্য জার্মানদের হাতে ব্রিটেন তো প্রায় পরাজয়ের মুখোমুখি হতে বসেছিল।

আগে যে ডুবোঘন্টার কথা বলা হয়েছে তা তো একরকমের ডুবোযানই, শুধু জলের তলায় নড়াচড়া করার ক্ষমতা তার নেই। ডুবোযান ব্যবহারের দুটি উদ্দেশ্য থাকে ঃ এক, সাগরতলে

অনুসন্ধান, জলের গভীরে ত্রাণ ও উদ্ধার ইত্যাদি এবং দুই, জলের অভ্যন্তরে আবাস স্থাপন। অর্থাৎ জলের তলায় মানুষের অবস্থান এবং কাজ করা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ডুবোযানের মাধ্যমে। এই শতাব্দীর সত্তর দশকের গোড়া পর্যন্ত সব ডুবোযানই চালক ও কর্মীসহ জলে প্রবেশ করত এবং এখনও অধিকাংশ ডুবোযান মনুষ্যচালিত। এই যানের বাইরে যথোচিত আলোর ব্যবস্থা থাকে এবং এর জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়।

সমুদ্রের গভীরতায় কাজ করার জন্য ডুবুরিরা এই যানের সাহায্যে জলস্তর থেকে গভীরে প্রবেশ করে। সঠিক দূরত্বে পৌঁছনোর পর জলরোধক দরজা দিয়ে তারা সাগরের জলে বেরিয়ে আসে। ডুবোযানটি তার অবস্থানের কাছাকাছি রাখা থাকে। তার ভেতর থেকে স্থিত এক তত্ত্বাবধায়ক ডুবুরিদের দিকে নজর রাখে। অসুস্থবোধ বা আহত হলে, কিংবা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তারা এই যানে ফিরে আসে। তাদের যানে অবস্থানের যে কক্ষ থাকে সেখানকার চাপ পার্শ্ববর্তী জলের চাপের সমান। যানে চালক ও অন্যান্য কর্মী বায়ুমন্ডলের চাপে থাকে। কাজ সাঙ্গ হলে ডুবুরিদের উপরে উঠিয়ে এনে ভাসমান জাহাজের চাপস্বাভাবিকরণ কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রত্যেক ডুবোযানের সঙ্গে জলস্তরে স্থাপিত জাহাজের যোগাযোগ থাকে।

ডুবোযানের চালক ও কর্মীদের একই হাওয়ায় বারবার শ্বাস নিতে হত, তাই এই হাওয়া সংবাহিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। ফিল্‌টার ও পরিশোধকের (purifier) ভেতর দিয়ে একে চালিত করা হয় হাওয়া থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইত বের করে দেওয়ার জন্য। ডুবুরিদের কক্ষে উচ্চ চাপে হাওয়া সরবরাহের আলাদা ব্যবস্থা থাকে। যানের ইঞ্জিনের শক্তি যোগানো হয় ব্যাটারি মারফৎ এবং ব্যাটারির দৌলতেই ভেতর ও বাইরেটা আলোকিত হতে পারে। বাইরে থেকে জলের নির্দিষ্ট মাত্রায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বা নিষ্কাশন করে যানের প্লবতা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই অনুসারে আরোহণ বা অবতরণ। অনেক ডুবোযানের সামনের দিকে যান্ত্রিক হাত থাকে এবং কিছু ক্ষেত্রে এই হাত দিয়েই ডুবুরির কাজ করা হয়। ইদানীং সমুদ্রতল থেকে কোন বস্তু আহরণের জন্য জলস্তরের জাহাজ থেকে সাঁড়াশি জাতীয় যন্ত্র সাগরতলে নামানো হয়। জাহাজের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী ডুবোযান বাইরেটা অবলোকন করে নির্দেশ পাঠায় তাকে নাড়ানোচাড়ানোর জন্য যতক্ষণ না প্রার্থিত দ্রব্য তার মুষ্টিবদ্ধ হয়। বলা বাহুল্য, ইলেকট্রনিকসের প্রভূত উন্নতির ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যা বর্তমান যে স্তরে পৌঁচেছে তাতে ডুবোযানে আজ চালক, কর্মী বা ডুবুরির প্রয়োজন নাও লাগতে পারে। মনুষ্যরহিত ডুবোযান (unmanned

submersible) সাগরতলে উদ্ধারের কাজে নবতম সংযোজন। 1985 সালের পয়লা সেপ্টেম্বর এইরকমের এক ছোট ডুবোযান আর্গো (Argo) উত্তর আটল্যান্টিক মহাসাগরের 3600 মিটার গভীরে টাইটানিককে খুঁজে বের করেছিল, একথা আগেই বলেছি। এ রকমের প্রায় 500 মত জলযান আজ বর্তমান।

সাগরে তেল ও গ্যাসের শিল্প যত গড়ে উঠেছে, যত গভীরে তেল অনুসন্ধান চলছে ততই এই রকম যানের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে মূলত সাগরতলের ছবি তোলার কাজে এসব জাহাজ ব্যবহার করা হতো। আজ এদের কাজ অনেক বিস্তৃত। জলের তলায় পরিদর্শন ও মেরামতের কাজে এরা বেশ উপযোগী। নিমজ্জিত পাইপলাইনের কপাটিকা (valve) খোলা ও বন্ধ করা, সাগরের প্লাটফর্ম সংস্থাপনের সময় বিভিন্ন কপাটিকা খুলে প্লাটফর্মের পাইপগুলোতে জলের অনুপ্রবেশ ঘটানো ইত্যাদি বহু কাজ সুষ্ঠুভাবে এরা করছে।

অর্থকরী দিক দিয়েও মনুষ্যরহিত ডুবোযান ব্যবহারের সুবিধে অনেক। জলের ভেতর কাজ করবার জন্য আর ডুবুরির প্রয়োজন হয় না। যেহেতু এই যানে মানুষ থাকে না, তাই একে যতক্ষণ খুশি চালানো যেতে পারে। শ্বাসকার্য বজায় রাখার জন্য হাওয়া সরবরাহের প্রশ্ন আর নেই, আর ডুবুরিকে চাপ স্বাভাবিকরণ কক্ষে রাখারও তাই প্রয়োজন নেই। তাই সময় ও ব্যয়ের পরিমাণ কমে যায়। সাগরের 3000 মিটার গভীরে একজন ডুবুরির দশ মিনিট কাজ করার জন্য খরচ পড়ে দশ হাজার ডলার, সেক্ষেত্রে এই যান ব্যবহার করলে সারাদিনে খরচ পড়ে বড় জোর পাঁচ হাজার ডলার। তাই সাগরের যত গভীরে মানুষের প্রবেশ ঘটেছে, এদের চাহিদাও তত বেড়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে ছোট মনুষ্যরহিত ডুবোযানের দাম 28000 ডলার, আর সবরকম সুযোগসুবিধা যুক্ত করে বড় যানের দাম কয়েক লক্ষ ডলার হতে পারে।

এই যানগুলি জলস্তরের জাহাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আর তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া জাহাজকে সক্রিয় ভাবে কাজ করার স্বাধীনতা যোগায়। তাই জলস্তরের পরিবেশ প্রতিকূল হলে কাজ ব্যাহত হয়, যদিও জলের তলায় যানের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। ডুবোযানের সঙ্গে জাহাজের সংযোগ থাকে তারের মাধ্যমে। তাই যত গভীরে যানের প্রবেশ ঘটে, তারের দৈর্ঘ্যও ততই বাড়তে থাকে। আর তার সঙ্গে সেটা ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়।

এই ডুবোযান পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় জলস্তরের জাহাজ থেকে। দিঙ্‌নির্ণয় ও চালকশক্তি যোগাবার ব্যবস্থা এই যানে থাকে। হেড্‌লাইট ও স্পটলাইটের আলো বেশ জোরালো হয়। জলের তলায় ভালভাবে দেখার জন্য টেলিভিসন ক্যামেরার ব্যবস্থা

থাকে। জলের ভেতর অনুসন্ধান চলাকালীন ক্যামেরা চালু করা হয় এবং সেখান থেকে ভিডিও ছবি প্রেরিত হয় জলস্তরের জাহাজে। এই যানের সাহায্যে কোন বস্তুর অন্বেষণ ও দিঙ্‌নির্ণয় করতে যে যন্ত্রগুলির সাহায্য সবার আগে দরকার তা হল সোনার (sonar) যা থেকে ক্রমাগত স্পন্দন বিচ্ছুরিত হয় এবং যা বৈদ্যুতিক সংকেতধ্বনি গ্রহণ করতে পারে, জলের গভীরতা মাপার যন্ত্র এবং চাপ পরিমাপের যন্ত্র। উল্লম্ব ও আনুভূমিক অধিষ্ঠিত মোটরগুলি (motor) চালকশক্তি যোগায়। এছাড়া এই ডুবোযানে থেকে দুটো যান্ত্রিক হস্ত যানের খোলের সংগে যুক্ত থাকে। কোন দ্রব্যকে মুষ্ঠিবদ্ধ করতে তাদের সক্রিয় করা হয়। এদের গতিবিধি সাধারণতঃ উপরের জাহাজ থেকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমে বেঁধে রেখে এদের মজবুত করা হয়েছে।

জলে ভাসমান জাহাজ থেকে তার মারফৎ ডুবোজাহাজে আদেশ পাঠানো হয় এবং প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা হয়। সেইমত এই ডুবোযান নিয়ন্ত্রিত ও চালিত হয়। তাছাড়া টেলিভিসানের সব সঙ্কেত আদানপ্রদান হয় এই তারের মাধ্যমে। এর প্রযুক্তি মূলত গড়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশে। যুক্তরাষ্ট্রের curv নামে ডুবোজাহাজ জলের তলায় 3000 মিটার পর্যন্ত যাবার ক্ষমতা রাখে।

যান্ত্রিক হাতের মুঠোয় একটা পরিমাপ আছে। তাই একটি নির্দিষ্ট মাপ ও ওজনের বস্তুকে সে ধরতে বা তুলতে পারে। বস্তুর মাপ যদি বড় হয়, তবে যান্ত্রিক হাতের মুঠোর মধ্যে তা আর আসে না। তখন সেই বস্তুকে তারের সংগে বেঁধে দেওয়া হয়। ওই তার (wire) অবশ্য অন্য কোন জাহাজের শক্তিশালী কপিকলের (winch) অংশবিশেষ। তবে বস্তুর সংগে এ তারটা বাঁধা সম্ভব হয় যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে। (চিত্র নং 9.8)

১০

সলিল সমাহিত সম্পদ উদ্ধার

স্বয়ংচালিত ডুবোযান যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে সমুদ্রের তলা থেকে অনেক কিছু জিনিসই উদ্ধার করতে সমর্থ, কিন্তু তার ক্ষমতার সীমা আছে। এসব ক্ষেত্রে ডুবুরিদের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার এক উদ্ধারকার্যের কথা আলোচনা করা যাক। সেই সময়ে ডুবোযানের সাহায্যে এই ধরনের কাজ করার প্রথা চালু হয়নি। নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড বন্দর থেকে 'নায়াগ্রা' ভেসেছিল 1940 সালের 18ই জুন। অত্যন্ত গোপনে সেই যাত্রীবাহী জাহাজে 295 বাক্স সোনার তাল নিচের দিকের একটি ডেকে তালাবন্দী করে রাখা হল। বাক্সগুলোতে সবশুদ্ধ আট টন সোনা ছিল যার দাম তখনকার দিনে 35 লক্ষ টাকার মত। যুদ্ধের বিভিন্ন সরঞ্জাম কেনাকাটার জন্য ব্যাংক অব্ ইংল্যান্ড ওই সোনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাচ্ছিল।

148 জন যাত্রী ও 203 জন জাহাজকর্মী নিয়ে ওই জাহাজের গন্তব্যস্থল ছিল প্রথমে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের সুভা, তারপর কানাডার ভ্যান্কুভার। যাত্রার ঠিক একদিন পরে ভোররাতে জাহাজের তলার দিকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। সম্ভবত জার্মানীর পাতা কোন মাইনের সংস্পর্শে এসে নায়াগ্রার এই দুর্ঘটনা। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে নায়াগ্রা আস্তে আস্তে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অতল জলে তলিয়ে গেল। তবে যাত্রী ও জাহাজকর্মী সকলেই রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু বাক্সবন্দী সে সোনা তলিয়েই গেল। তাই শুরু হ'ল সেই সোনা উদ্ধারের প্রয়াস।

জে পি উইলিয়ামসের নেতৃত্বে শুরু হল কাজ। প্রধান ডুবুরি হিসেবে থাকলেন জলের তলায় 160 মিটার গিয়ে তখনকার দিনের বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী জন জনস্টোন। রক্ষাকর্তার দল ক্লেমোর নামে এক উপকূলবাহী জাহাজকে পরিবর্তন করে কাজে লাগল। ওই অঞ্চলে প্রচুর বিস্ফোরক থাকার আশংকায় প্রথমে নৌসেনারা নিযুক্ত হল এলাকাটা পর্যবেক্ষণ এবং সেখান থেকে সমস্ত রকম বিস্ফোরক মুক্ত করার কাজে। সমুদ্রের 7 বর্গমাইল এলাকা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। অবশেষে প্রায় দুমাস অনুসন্ধানের পর নায়াগ্রার সমুদ্রতলের অবস্থান জানা গেল। সে একপাশে 70 ডিগ্রি কাত হয়ে 134 মিটার

গভীরতার নরম মাটির উপর শুয়ে আছে।

এবার ক্লেমোরকে সাগরের বুকে শক্ত করে বেঁধে রাখার জন্য বিভিন্নভাবে নোঙরের ব্যবস্থা হল। জাহাজের ওই অবস্থায় কিভাবে স্ট্রং রুমে যাওয়া যায় তার উপায় চিন্তা করা শুরু হল। জাহাজের সব নক্সা খুলে বসা হলো। জনস্টোন জাহাজের একটা কাগজের মডেল বানালেন। বিস্ফোরণের ফলে যে সব জানলাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেইসব স্থানগুলো চিহ্নিত করা হল। ঠিক করা হল একমাত্র বিস্ফোরণের সাহায্যে জাহাজের একটা পাশ বিনষ্ট না করলে স্ট্রংরুমে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। আবার সে ব্যাপারে যথেষ্ঠ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।বিস্ফোরণের ফলে যাতে স্ট্রংরুম ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়।

এদিকে শীতকাল শুরু হয়ে গেছে। ঠান্ডা হাওয়া বেশ জোরে বইছে। দিনের আলোর ব্যাপ্তি অনেক কমে এসেছে। একটু একটু করে বারুদ দিয়ে দিনের পর দিন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কাজ এগোতে থাকে। আর নির্গত সব পদার্থ পরিষ্কার করার পালা চলে। ডুবুরিরা নিচে নেমে আসে। পর্যবেক্ষণ কক্ষ থেকে ময়লা অপসারণের আদেশ দেয়—সাঁড়াশি জাতীয় যন্ত্র ঘোরাঘুরি করে কোন কিছু দখল করার



প্লেট নম্বর 10.1 ঃ ক্লেমোরের ডেকে তাল তাল সোনা

উদ্দেশ্যে তার ইঙ্গিত অনুসারে। অবশেষে দশমাস পরিশ্রমের পর দরজা একদিন খোলা গেল। তারপর দখল যন্ত্র (grab) বারবার উঠতে আর নামতে শুরু করল। জাহাজে উঠে আসতে লাগল তাল তাল সোনা। কিছু সোনা তোলা হতেই জাহাজ তীরে এসে ব্যাঙ্ক অব্ নিউজিল্যান্ডকে হস্তান্তরিত করে গেল তা। এইভাবে বেশ কয়েকবার জাহাজ তীরে এল আর গেল। 1941 সালের 8ই ডিসেম্বর 590টা সোনার তালের মধ্যে 555টা সাগরের তলা থেকে তোলার পর তারা বুঝল আর তোলা সম্ভব নয়।

এই উদ্ধারের কাহিনী এইখানেই শেষ হত যদি না আর এক বৃটিশ উদ্ধারকারী দল এর প্রায় 12 বছর পরে বাদবাকি 35টা সোনার তালের ভেতর 17টা সাগরের বুকে উঠিয়ে না নিয়ে আসত। আধুনিক যুগের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক নবতম পন্থা অবলম্বন করে যদি ডুবন্ত নায়াগ্রা থেকে উদ্ধারকার্য চালানো হত তবুও ডুবুরি না পাঠিয়ে এই ধরনের উত্তোলন সম্ভব হত না।

অন্য ঘটনা। পৃথিবীর সমস্ত দেশকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এজন্য প্রতি দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীকে প্রায়ই বিভিন্ন কাজের মহড়া দিতে হয়। এরকমই একটা মহড়া দিচ্ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী। পরিকল্পনা ছিল যে দুটো বোমারু বিমান বি 52 যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারোলিনা শহর থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে রাশিয়ার সীমা অবধি এসে আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবে। প্রত্যেক বিমানে পাইলটসহ সাতজন কর্মী ছাড়া প্রায় আড়াই টন ওজনের চারটে প্লুটোনিয়াম–ইউরেনিয়াম 235 হাইড্রোজেন বোমা ছিল। এই বোমাগুলির ভেতর তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে। শুধুমাত্র উপর থেকে মাটিতে ফেলে বা অন্য কোন উপায়ে জোরে আঘাতের ফলে এদের বিস্ফোরণ হয় না। এদের ফাটিয়ে পারমাণবিক প্রক্রিয়া শুরু করতে গেলে এতে কিছু 'গোপনীয়' কাজ করতে হয়। তা সম্ভব হয় একমাত্র ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে।

মহড়ার ওই বোমারু বিমানদুটির যাত্রা শুরু হবার পর শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামার কোন নির্দেশ ছিল না। একবারও স্থল স্পর্শ না করে আকাশপথে এই বিরাট দূরত্ব পাড়ি দেবার সমস্যা একটাই, তা হল একনাগাড়ে ওড়ার ফলে বিমানের মজুত জ্বালানি তেল নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আকাশপথেই একটা তৈলবাহী বা ট্যাংকার বিমানের সাহায্যে তেল ভরার ব্যবস্থা করা হল। কাজটা করা কিন্তু খুব সহজ নয়। আকাশপথে যে বিমান তেল নেবে তাকে ট্যাংকার বিমানের তলায় আসতে হবে। ট্যাংকার থেকে তেলের নল ফেলে তা অন্য বিমানে যুক্ত করতে হবে। তারপর হয় তেলের আদানপ্রদান। এই সময় দুটো বিমান একই গতিতে উড়ে চলে। মনে রাখা দরকার জ্বালানি তেল অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। তাই গতির

সামান্য হেরফের হলে বিমানে আগুন লেগে যেতে পারে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিমান ধ্বংস হয়ে গেলেও অবাক হবার কিছু থাকে না।

1966 সালের 16ই জানুয়ারি বোমারু বিমান দুটোর যাত্রা শুরু হল। পূর্বদিকে ওড়ার সময় স্পেনের উপর তারা ট্যাংকারের সাহায্যে তেল নিল। রাশিয়ার সীমানা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌছানো গেল। এবার ফেরার পালা। ফেরার সময়ও স্পেনের উপর জ্বালানি তেল নেবার কথা।

ট্যাংকার বিমান স্পেনের বিমানঘাটিতে রাখা ছিল। রেডিও মারফৎ কথাবার্তা বলে বিমানচালকরা তেল ভরার ব্যাপারে সবকিছু ঠিকঠাক করল। কথামত একটা বোমারু বিমান উড়ন্ত ট্যাংকারের নিচে চলে এল। অপর বোমারু বিমানটি বেশ কিছু পেছনে থাকার কথা। একটা বিমানে তেল ভরে নেবার পর অপর ট্যাংকারের সাহায্যে অন্য বোমারু বিমানটি তেল নিয়ে নেবে, এরকমই ঠিক ছিল। উড়ন্ত ট্যাংকার থেকে প্রথম বোমারু বিমানটা যখন তেল নিতে ব্যস্ত, তখন ট্যাংকারের বিমানচালকের হঠাৎ নজরে এল যে অন্য বোমারু বিমানটি তার অত্যন্ত কাছে এসে গেছে। তক্ষুণি সে রেডিও মারফৎ সাবধান করে দিল। ওই বোমারু বিমানের পাইলটও যখন ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারল, তখন তার বিমানের গতি এতই বেশি যে তার আর কিছুই করার রইল না।

দুটো বিমানে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত ওই আওয়াজ গিয়ে পৌছল। দুর্ঘটনাস্থলের ঠিক নিচের জমির 6 মাইল ব্যাসার্ধের সবকিছু ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠল। নিমেষেই তারা টুকরো টুকরো হয়ে নিচে নেমে আসতে লাগল। দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে বোমারু বিমানের পাইলট বোতাম টিপে প্যারাসুটযুক্ত চারটে হাইড্রোজেন বোমা নিচে ফেলে দিয়েছিল। বিমান ধ্বংস হবার আশঙ্কা দেখা দিলে এইভাবে বোমা নিচে ফেলে দেবার নির্দেশই বিমানচালকদের দেওয়া হয়েছিল।

দুর্ঘটনাস্থলের কাছেই ছিল অপর ট্যাঙ্কারটি যা অন্য বোমারু বিমানকে তেল দেবে বলে নীচে দাঁড়িয়েছিল। বিস্ফোরণের আওয়াজ তো সে শুনতে পেলই, তার উপর সে দেখল আকাশের গায়ে লাল আগুনের গোলা। সে সঙ্গে সঙ্গে রেডিও মারফৎ এই সংঘর্ষের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন এতই উন্নত যে দুর্ঘটনার 10 মিনিটের মধ্যেই খবরটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে পৌছে গেল।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অনুসন্ধান। বিশেষ করে পারমাণবিক বোমাগুলির জন্য। প্রথমে সন্ধান মিলল বিমানের একটি

চাকার—প্যালামেয়ারের উত্তর সীমায় সেটি পাওয়া গেল। পশ্চিমদিকের একটি টমেটো ক্ষেতে বিমানের ডানদিকের ডানার সন্ধান মিলল। বিমানের জ্বালানি তেল হাওয়ায় উবে যাওয়ার ফলে হয়রানি কিছু কম হয়েছিল। স্থলের বাড়ি, মানুষ বা জন্তুদের কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি।

প্যালামেয়ার ভূমধ্যসাগরের তীরে দুর্ঘটনার সময় ওই অঞ্চলের কিছু জেলে সেখানে মাছ ধরছিল। তারা তিনজন প্যারাসুট পরিহিত বিমানকর্মীকে সাগরে পড়তে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাগুলো এগিয়ে গেল তাদের উদ্ধার করতে। এছাড়া জেলেরা আরও ছটা প্যারাসুট পড়তে দেখেছিল। এদের মধ্যে চারটে, নৌকা থেকে অনেকদূরে পড়েছে বলে অনুমান করা হল। তা স্থলে না জলে তা সঠিক করে বলা মুশকিল হয়ে পড়ল। অন্য দুটো প্যারাসুট নৌকার কাছাকাছি পড়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে ভারি কিছু জিনিস ঝোলানো থাকায়, সেগুলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে যায়।

যে তিনজন বিমানকর্মীকে জেলেরা উদ্ধার করেছিল, তার মধ্যে একজন হল বিমানের ক্যাপ্টেন। নৌকাগুলো তীর থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না, তাই চার্ট থেকে জায়গাটার মোটামুটি অবস্থান সে জেনে নিল। জায়গাটার কাছে আলমানজারো নদী ভূমধ্যসাগরে মিশেছে।

সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই ওই নদীর ঢালু তীরে প্রথম বোমাটির সন্ধান পাওয়া গেল। প্যারাসুটের সঙ্গে সেটি তখনও যুক্ত। বোমার গায়ে ফাটলের কিছু দাগ আছে বটে, কিন্তু এমনিতে সে অক্ষত। ঘন্টা পাঁচেক অনুসন্ধানের পর আরও পশ্চিমের দু মাইল দূরে আরও একটি বোমা পাওয়া গেল এবং তার আধ মাইল দূরে আরেকটি। এই দুটি বোমা মাটিতে পড়ে বিরাট ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। এদের বিস্ফোরণ ঘটেনি বটে, কিন্তু তার গা দিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিয়ে এসেছিল। তার জন্য অন্য এক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেটা অন্য প্রসংগ। সান্ত্বনা শুধু এইটুকুই ছিল যে চারটের মধ্যে অন্ততঃ তিনটে বোমার হদিস নিরুপদ্রবেই মিলেছে।

এবার শেষ বোমাটিকে খুঁজে বের করার পর্ব। স্থলভাগে পরপর পাঁচ দিন ধরে তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরও যখন তাকে পাওয়া গেল না, তখন ধরে নেওয়া হল যে সেটা সমুদ্রে পড়েছে। জেলেরা তো বারবারই বলেছিল যে দুটো প্যারাসুট তারা সাগরের জলে পড়তে দেখেছে যার সঙ্গে ভারি জিনিস লাগানো ছিল। তার মধ্যে একটা যে হাইড্রোজেন বোমা নয়, তা কেই বা বলতে পারে।

জেলেদের বিবরণ অনুসারে সাগরের 120 বর্গমাইল এলাকা অনুসন্ধানের জন্য ঠিক করা হল। এর মধ্যে সাগর কোথাও কোথাও

1000 মিটার গভীর। সাগরের তলাকার এই বিরাট এলাকা হাতড়ে প্যারাসুটকে খুঁজে বের করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। অগভীর জলে ডুবুরি নামানো হল। তারা বিমানের অনেকগুলো টুকরো নিয়ে এল বটে, কিন্তু বোমার সন্ধান তারা দিতে পারল না।

বেশি গভীর জলে ডুবুরি নামানোর অনেক ঝকমারি। তাই ডিপ জিপ নামে এক সাবমেরিন তলব করা হল। এদের 650 মিটার গভীরতা অবধি যাবার ক্ষমতা আছে। দুদিন ধরে তারা সমুদ্রের ভেতর বিভিন্ন গভীরতায় ঘোরাফেরা করে 28টা 'বস্তুর' সন্ধান পেল। এগুলো অবশ্য হয় প্লেনের টুকরো, নয় অন্য কিছু, অর্থাৎ প্রার্থিত সেই হাইড্রোজেন বোমাটি ছাড়া আর সব কিছুই।

আরও গভীরে যাওয়া দরকার। তাই আলভিন এবং অ্যালমিনট নামে দুটো ডুবোযানের সাহায্য নেওয়া হল। এরা জলের তলায় অনেকক্ষণ অনুসন্ধান চালাতে পারে। অ্যালভিন 7 মিটার লম্বা, 2.8 মিটার চওড়া এবং এর ওজন 13 টন। এতে কর্মীর সংখ্যা 31, এ যান একনাগাড়ে 24 ঘন্টা চলাফেরা করতে পারে। এর গতি ঘন্টায় 4 নট। এ যান সমুদ্রের 2000 মিটার গভীরে যাবার ক্ষমতা রাখে। এই যানের বাইরে আলো ফেলার ব্যবস্থা আছে।

অ্যালভিনের চেয়ে আকারে অ্যালমিনট অনেক বড়। লম্বায় 17 মিটার, চওড়ায় 2.8 মিটার এবং ওজন 81 টন। এর ভেতর 6 জন কর্মী থাকে। এটি 2000 মিটার অবধি ডুব দিতে পারে। এছাড়া স্পট লাইট, টেলিভিসান ক্যামেরা ইত্যাদি সব রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা এতে মজুত আছে।

এই ডুবোযানদুটো পাঠানোর আগে একটা মাইন সুইপার অনুসন্ধান এলাকায় পাঠানো হল। এর কাজ অনেকটা দড়ি ঝুলিয়ে সাগরতল ঝাঁট দেওয়ার মত। এর ফলে প্রায় 650 মিটার গভীরতায় কিছু পড়ে আছে বলে মনে হল। 14ই ফেব্রুয়ারি অ্যালভিন এবং অ্যালমিনটকে পাঠানো হল ওই গভীরতায় অনুসন্ধান চালানোর জন্য। বাইরের আলো ও টেলিভিসান ক্যামেরা চালু করা হল। টেলিভিসানের পর্দায় কিছু ভেসে উঠলে কয়েক জোড়া চোখ অনেক আশা নিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খুঁটিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—না ওটা হাইড্রোজেন বোমা নয়। আবার ডুবোযান আর একদিকে ডুব দিয়ে চলে।

এইভাবে আশানিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে 12ই মার্চ হল। অন্য দিনের মত এদিনও স্বাভাবিকভাবে অনুসন্ধানপর্ব চলছিল। সে জায়গাটায় ডুবো পাহাড়, আর তা বেশ ঢালু। তাই অ্যালভিন খুব সাবধানে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ে পড়ে থাকা জিনিসগুলোকে সে খুব সতর্কভাবে দেখে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল প্যারাসুটের দড়ির মত কি একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে। তাই

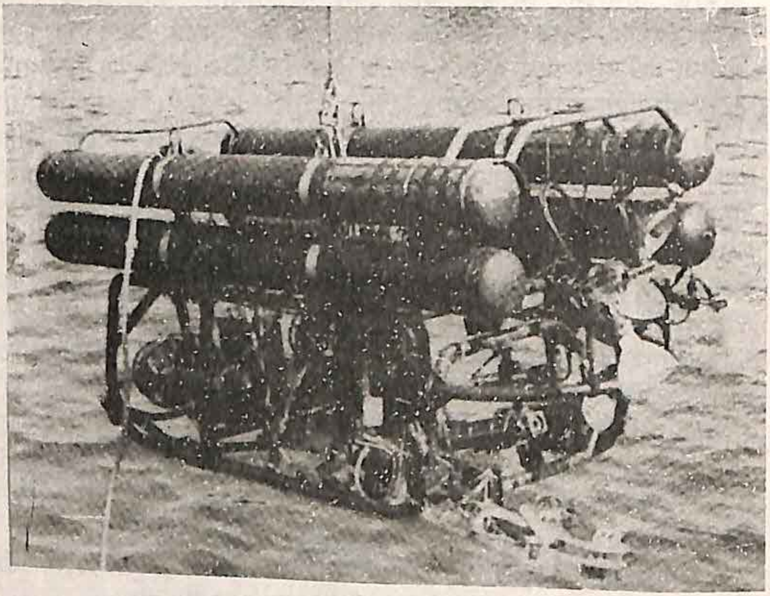
তো, আর সঙ্গে একটা ভারি জিনিসও লাগানো আছে বটে। এবার আর চোখকে অবিশ্বাস করা যায় না। তাহলে হাইড্রোজেন বোমাটা সত্যিই সমুদ্রের ভেতর পড়েছে। জলস্তর থেকে 800 মিটার গভীরে পাহাড় যেখানে 70 ডিগ্রী ঢালু সেখানে বোমাটা পড়ে আছে। তবে পাহাড়ের গা দিয়ে যদি একবার গড়াতে শুরু করে, তবে তা 1250 মিটার গভীরতা অবধি চলে যেতে পারে। তীর থেকে এ জায়গাটার দূরত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল।

বোমাটার সন্ধান যখন মিলেছে তখন কাজ হল তাকে উঠিয়ে আনা। মিজার নামে এক নৌগবেষণা জাহাজ থেকে একটা লোহার আঁকশি জলে নামিয়ে দেওয়া হল। অ্যালভিনের যান্ত্রিক হাত প্যারাসুটের সঙ্গে আঁকশিটা বেঁধে দিল। তারপর মিজার থেকে আঁকশিযুক্ত প্যারাসুট টেনে তুলে আনা শুরু হল। কিন্তু বিধি বাম, তা না হলে বোমাটা যখন জাহাজের কাছাকাছি, তখনই হঠাৎ প্যারাসুটসহ বোমাটা খুলে গেল। তারপর ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগল সাগরের জলে। সেদিন ছিল 24 মার্চ।

আবার খোঁজা শুরু হল। অ্যালভিন আর অ্যালমিনট আবার ডুবে চলল। ছদিন ধরে সাগরতলের ওই এলাকা তোলপাড় করার পর অ্যালভিনই বোমাটার আবার হদিস দিল। আগে যেখানে সেটি পাওয়া গিয়েছিল, সেখান থেকে 40 মিটার দূরে তা সরে গেছে। চলে গেছে আরও 80 মিটার গভীরে। এবার কিন্তু ফসকালে আর চলবে না, যে ভাবেই হোক তাকে উঠিয়ে আনতে হবে।

এই কাজের জন্য তখনকার দিনের সবচেয়ে উন্নত ডুবোযান কার্ভকে (CURV) নিয়ে আসা হল। এর চেহারা (প্লেট নং 10.2) ছোটখাট হলেও জলের তলায় অনেকরকমের দুরূহ কাজ সে করতে পারে। সে প্রথমে ডুবন্ত প্যারাসুটের মাথায় নাইলন দড়ি বেঁধে সেটাকে একটা ভাসন্ত বয়ার সংগে আটকে দিল। এইভাবে পরপর ছটা দড়ি বাঁধল। কিন্তু 7ই এপ্রিল যখন কার্ভ শেষ দড়িটা বাঁধার জন্য নেমে এল, তখনই ঘটে গেল বিপদ। অতগুলো দড়ির ভেতর দিয়ে চলতে গিয়ে সে তাদের মধ্যে আটকে গেল। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। এ অবস্থায় ঠিক করা হলো প্যারাসুট যুক্ত বোমা ও কার্ভকে একসঙ্গে উঠিয়ে আনা হবে।

পেট্রল নামক এক জাহাজ বয়া থেকে দড়িগুলো খুলে ফেলল। তারপর অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে দড়ি ধরে টান দিতে লাগল। দড়ির অপর প্রান্ত প্রায় 1000 মিটার নীচে এবং তাতে প্রায় আড়াই টন বোমার সংগে লাগানো আছে এক টন ওজনের কার্ভ। জলস্তরের 15 মিটার অবধি তাদের উঠিয়ে আনা হল। তারপর ডুবুরি নিচে এল দড়ির বাঁধন থেকে কার্ভকে মুক্ত করতে। অবশ্য বোমাটা দড়ির সঙ্গে যাতে যুক্ত থাকে তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা হল। কার্ভকে দড়ি



প্লেট নম্বর 10.2 ঃ ডুবোযান কার্ভ

থেকে খুলে ফেলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোমাটা জাহাজের ডেকে তুলে আনা হল। ক্যালেন্ডারের পাতায় সেদিন ছিল 22শে এপ্রিল।

এই উদ্ধার কাজে সবশুদ্ধ 17টা জাহাজ ও 3400 লোক নিযুক্ত ছিল। এতে খরচ পড়েছিল প্রায় 150 কোটি টাকা। সমুদ্র থেকে 300 মত টুকুরো তুলে আনা হয়েছিল– এর মধ্যে ছিল 50 টন ওজনের বিমানের টুকরো অংশ। অবশ্য সবচেয়ে দামী জিনিস যেটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা যে হাইড্রোজেন বোমা, তাতে আর সন্দেহ কি।

১১

কনিষ্কের ব্লাক বক্স উদ্ধার

কনিষ্ক বলতে সেই চিরপরিচিত মুন্ডহীন মূর্তিটাই বুঝি চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভারতের এই মহান্ সম্রাটের মহতী কীর্তি ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে আকাশপথের যাত্রার এক শোচনীয় ট্র্যাজেডি। মর্মান্তিক সংবাদটা এসে পৌঁছেছিল 1985র 23 শে জুন। 327 জন যাত্রী ও কর্মীসহ এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং বিমান কনিষ্ক উত্তর আটলান্টিকের বুকে নিক্ষিপ্ত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি – বিমান চালনার ইতিহাসের অন্যতম নিদারুণ ও নিষ্করুণ দুর্ঘটনার যদি কোন জীবন্ত সাক্ষী মেলে। কনিষ্কের শেষ খবর পাওয়া গেছে যখন সে আয়াল্যান্ডের তীর থেকে 180 মাইল দূরে হিথরো এয়ারপোর্টে অবতরণের আয়োজনে ব্যস্ত। দিনরাত প্রকৃতি ও পরিবেশ উপেক্ষা করে সন্ধান চালানো হতে থাকল। কয়েকদিন তল্লাসী চালানোর পর অর্ধেকসংখ্যক যাত্রীরও মৃতদেহ পাওয়া গেল না। আর একই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিমানের শতধাবিচ্ছিন্ন খন্ড খন্ড অংশের অন্বেষণ।

রেডারের (Radar) পর্দা থেকে বিমানের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া এবং জীবনমরণের মুখোমুখি পরিস্থিতিতে কোন বিপদসংঙ্কেত না পাঠানোর পেছনে সঠিক কি কারণ থাকতে পারে, এ নিয়ে অনেক কিছু অনুমান করা হল। দুর্ঘটনার হেতু অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার তদন্ত কমিশন গঠন করলেন। বিচারপতি বি. এন্. কিরপাল হলেন তার চেয়ারম্যান। প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগে উন্নত দেশগুলোর ভূমিকা কিছু কিছু ব্যাপারে অপরিহার্য হ'ল। ব্রিটেন, আয়ার্ল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। নির্ভুল তথ্য নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন নিশ্চিহ্ন বিমানের 'ব্ল্যাক বক্সগুলো'।

'ব্ল্যাক বক্স' বলতে বোঝায় বিমানের দুটো যন্ত্র–চালক ধ্বনি-নির্ধারক যন্ত্র (Cockpit Voice Recorder বা CVR এবং উড্ডয়ন তথ্য যন্ত্র (Digital Flight Data Recorder বা DFDR)। বিমানচালক কক্ষের (ককপিট) সমস্ত কথাবার্তা ধরা থাকে চালক ধ্বনি-নির্ধারক যন্ত্রে। এটা একটা টেপ রেকর্ডার ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে প্রতি আধঘন্টা অন্তর অন্তর টেপ ঘুরে গিয়ে

আবার প্রথম থেকে শুরু হয়–তাই শেষ তিরিশ মিনিটের ককপিটের কথোপকথন জানা যায় এই রেকর্ডারে। বিমানের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য যেমন বিমানের উচ্চতা, ইঞ্জিনের গতি, ত্বরণ, আন্দোলন, দোলন ইত্যাদি সংগৃহীত থাকে উড্ডয়ন তথ্য যন্ত্রে। দুর্ঘটনার প্রাকমুহূর্তের বিবরণ জানা একমাত্র সম্ভব এদেরই মাধ্যমে।

কিন্তু সমুদ্রের অন্তহীন পরিধির সীমাহীন জলের গভীরে তার গর্ভের কোন এক স্থানে তারা অবস্থান করছে–তার ঠিকানা যোগাড় করাই তো প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ ব্যাপারে সাফল্য মিললে পর সেই বিশাল গভীরতা থেকে তাকে জলস্তরের উপরে উত্তোলন করতে হবে। বিমানের ভগ্নাংশের কিছু কিছু দ্রব্য ভেসে থাকে বটে কিন্তু প্রায় ২০ কেজি ওজনের ব্ল্যাকবক্সগুলোতো আর জলের উপরে ভাসমান অবস্থায় শোভা পাবে না। তাই মানুষের প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ এসে উপস্থিত।

কনিষ্কের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করার ব্যাপারে একটা উপযুক্ত ডুবোযানের সাহায্য নেওয়া দরকার পড়ল। নিযুক্ত করা হল স্কারাব (Scarab) (প্লেট নং 9.4)। এটির মালিকানা একটি বহুদেশীয় সংস্থার। 1974 সালে এটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। ব্ল্যাক বক্স উদ্ধারের জন্য যে ভাসমান জাহাজ একে সাহায্য করেছিল তা হল লিঁও থেভনিঁ (Leon Thevnin) নামক এক ফরাসী জাহাজ। পরের দিকে জন কোবট নামক কানাডার এক জাহাজ এর সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিল। ব্লাকবক্স ওঠানোর পর বিমানের অন্য ভগ্নাংশের কিছু কিছু সাগরতল থেকে তোলা হয়েছে। তাতে জন কোবট অনেক সহায়তা করেছিল।

সমুদ্রতল থেকে কোন দ্রব্য উদ্ধারের কাজে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তার অবস্থান নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা। বিরাট চওড়া ও গভীর পুকুরের সূচ সন্ধানের মত অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে সমুদ্রে বস্তুর সঠিক অবস্থিতি জানা। সমুদ্রের গভীরে আবার আলকাতরার মত সূচীভেদ্য অন্ধকার। দুটি জাহাজ থেকে দড়ি ঝুলিয়ে সমুদ্রতল ঝাঁট দেওয়া ছিল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পন্থা। বর্তমানে সোনারের সাহায্যে বস্তুর অবস্থান জানার চেষ্টা করা হয়। জলের ভেতর দিয়ে শব্দতরঙ্গ পাঠানো হয় এবং তা বস্তুতে প্রতিহত হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর এই তরঙ্গ যাতায়াতের সময় মাপা হয়। জলের ভেতর শব্দের গতিবেগ জানা থাকলে, বস্তুর দূরত্বের অনুমান করা যায়। এইভাবে ধীরে ধীরে সন্ধানের এলাকা হ্রাস পেতে থাকে। তবে একই আকৃতি ও আয়তনের অনেকগুলো বস্তু ওই এলাকার সমুদ্রতলে বিরাজ করলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। যখন সন্ধানে পরিধি যথেষ্ট ছোট হয়ে আসে, তখন ওই ছোট এলাকার প্রত্যেক বস্তুই পরীক্ষিত হয়। আজকাল টেলিভিসান ক্যামেরা যুক্ত ডুবোযানের সাহায্যে এই কাজ

অনেক সহজ হয়ে গেছে।

বিমানের ভাসমান ভগ্নাংশের যেটুকু মিলল তা সমগ্র কনিষ্কের অবয়বের শতকরা ২ ভাগও হবে না। মূলত এরা হল বিমানের কিছু কিছু হাল্কা জিনিসপত্র, যেমন প্লাস্টিকের মাল রাখবার তাক, প্যানেল, গদি, বসবার জায়গা ইত্যাদি। ব্লাক বক্সদুটো সমুদ্রের তলায় স্থান করে নিয়েছে। তবে জলের ভেতর প্রবিষ্ট হলেও সেখান থেকে ক্রমাগত সঙ্কেত ধ্বনি নির্গত হচ্ছিল—একে অনুসরণ করতে পারলে অনুসন্ধানের প্রচুর সুবিধে হবে। এই সঙ্কেত ধ্বনি না থাকলে ব্লাক বক্স খুঁজে বের করা যেত না যে তা নয়, তবে সমস্ত উদ্ধারকার্য আরো অনেক সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। ব্লাক বক্সের সঙ্কেত ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসবে, আর চার সপ্তাহ পরে তা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সময়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল।

দুর্ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ব্রিটিশ ও আইরিশ তরীরা উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে নেমে পড়ল। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক ডুবোযান নিয়ে আসার কথা চিন্তা করা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিযুক্ত হল স্কারাব। শেষ যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করে মহাসাগরের মোটামুটি একটা এলাকা চিহ্নিত করা হল—প্রস্থে সে এক মাইল আর দৈর্ঘ্যে দশ মাইল। প্রায় অষ্টআশি ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করার পর স্কাবার যে বস্তু সাগরের বুক থেকে প্রথম তুলে আনল তা হল বিমানের মাল উঠাতে নামাতে সহায়তা করে এমন একটি 18 বর্গ সেন্টিমিটারের বাক্স।

লক্ষ্য তার কিন্তু কনিষ্কের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার। সমুদ্রের দু কিলোমিটার গভীর দিয়ে ধেয়ে চলল সে। লিঁও থেভেনিঁ জাহাজ থেকে আটজন কেব্‌ল ও ওয়ারলেস ইঞ্জিনিয়ার তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কাজে লিপ্ত। ব্লাক বক্সের সঙ্কেতধ্বনি ধরে এগিয়ে যেতে মাত্র অল্প কয়েকদিনের ভেতর স্কারাব তাদের কাছে এসে গেল। 7 ই জুলাই মাত্র 100 মিটার দূর থেকে সঙ্কেত পেতে লাগল। সন্ধানের এলাকা 200 বর্গমিটারে নেমে এল। কিন্তু তবুও সঠিক অবস্থান তার আর জানা হয়ে উঠছিল না কাছাকাছি জায়গা থেকে দুটো ভিন্ন স্পন্দনের সঙ্কেত আসছিল। স্কারাবকে আরো একটু এগিয়ে নিয়ে টেলিভিসান চালু করা হল। বলা বাহূল্য, জলযানের বাইরের সবরকমের আলো তখন জ্বল জ্বল করছে। লিঁও থেভেনিঁর টি ভি পর্দায় সাগরতলের ছবি ভেসে উঠতে লাগল। ভিডিও ছবি থেকে চালক ধ্বনি নির্ধারক যন্ত্রকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না। একবার যখন সঠিকভাবে বস্তুকে চিহ্নিত করা গেছে, তখন তাকে উত্তোলনের আর অসুবিধে কি! বিশেষ করে, ডুবোযানকে যখন তার অত্যন্ত কাছে নিয়ে যাওয়া গেছে।

জলযানের যান্ত্রিক হাতকে এবার সক্রিয় করা হল এবং তার নিয়ন্ত্রণ চলল যতক্ষণ না চালক ধ্বনি নির্ধারক যন্ত্রকে তার মুষ্টির দ্বারা স্পর্শ করে। সাগরজলের গভীরতা সেখানে 2040 মিটার। এর আগে সাগরের অত গভীরতা থেকে কোন দ্রব্য উদ্ধার করা হয়নি। তারপর যন্ত্রটাকে ধীরে ধীরে উপরে তুলে আনা হল। উড্ডয়ন তথ্য যন্ত্র পড়ে ছিল চালক ধ্বনি নির্ধারক যন্ত্র থেকে 400 মিটার দূরে। সমুদ্র সেদিন বেশ অশান্ত ছিল, তবু তাকে একই ভাবে উঠিয়ে আনা গেল। সে বাক্সটার ওজন ছিল প্রায় 20 কিলোগ্রাম। জাহাজের উপর তুলে আনার পর ওই যন্ত্র দুটোকে সমুদ্রজলভর্ত্তি কানেস্তরার (Canister) ভেতর রেখে তার মুখ নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর তাকে জাহাজে করে আয়ার্ল্যান্ডের কর্ক বন্দরে নিয়ে আসা হল। বন্ধ ক্যানেস্তারা সেখানে সমুদ্রের জলভর্তি চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা হল। ব্লাক বক্স নির্মাতাদের ওই রকমই নির্দেশ ছিল। অল্প কদিনের এই উদ্ধার কার্যে খরচ পড়েছিল প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা।

এর পরের তিন মাস ধরে আরও অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। দেখা গেছে কনিষ্কের ধ্বংসাবশেষ আটলান্টিক মহাসাগরের 6.5 কিলোমিটার লম্বা ও 3 কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সাগরতলের বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও টেপ থেকে জানা গেল যে বিমানের অন্ততঃ 300 টা টুকরো ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কিছু কিছু ভগ্নাংশের ভেতর মৃতদেহও দেখা গেছে। 15 ই অক্টোবর বিমানের কাঠামোর একটা 6 মিটার লম্বা অংশ ওঠানো হল। এক্ষেত্রে জলস্তরের জাহাজ ছিল জন কোবট। সে ডুবোযানকে পরিচালনা করেছিল। ওই ভগ্নাংশের গায়ে তার দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল স্কারাব। আর ক্রজট্রাম নামক এক সরবরাহ জাহাজ থেকে উইঞ্চের (winch) সাহায্যে তাকে উপরে ওঠানো হল। ধ্বংসাবশেষের সব কিছু ওঠানো সম্ভব হয়নি, তবে সঠিক তথ্য নিরুপণের সহায়ক হবে এমন কিছু কিছু বিশেষ অংশ উত্তোলন করা হয়েছিল।

সাগরতল থেকে বিমানের ভগ্নাংশ উঠিয়ে আনার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল। এই সব টুকরো টুকরো অংশ অনুসন্ধানের সহায়ক হবে। দুর্ঘটনার কারণটা জানাই তো তদন্তের মূল উদ্দেশ্য—বিমান মাঝ আকাশে ভেঙে গিয়েছিল, না সে সাগরের বুকে আছাড় খেয়ে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছিল। কারণটা সঠিক জানা গেলে তারপর নয় নির্ধারণের চেষ্টা করা যাবে এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে—পাইলট ও বিমানব্যবস্থার ত্রুটি, না বিমানের যান্ত্রিক গোলযোগ, না এটা মানুষের কোন নৃশংস পরিকল্পনা।

অনেক মেহনৎ করে ব্লাকবক্সসমেত বিমানের কিছু ভগ্নাংশ

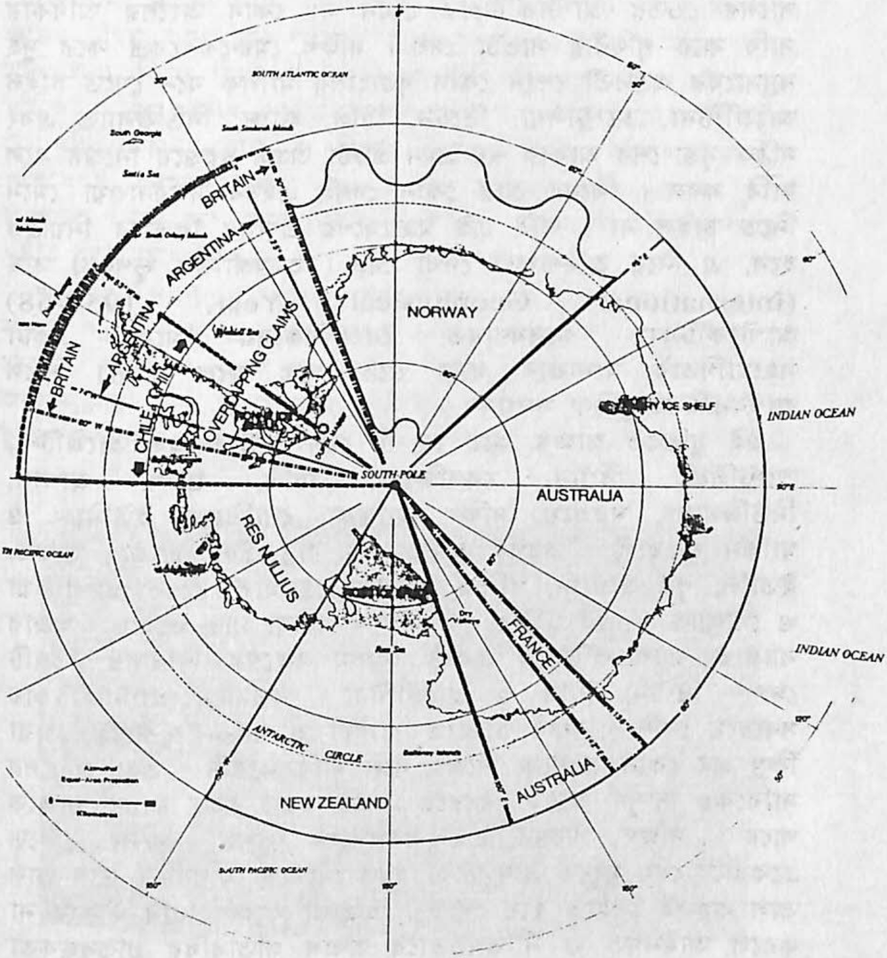
ওঠানো হল। তারপর শুরু হয়ে গেল বিমান ধ্বংস নিয়ে বিচারপতি কিরপাল কমিশনের কাজ। কয়েকমাস তদন্ত চালিয়ে কমিশন তার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশও করেছেন। তবে সে রিপোর্ট সাধারণে প্রকাশ করা হয়নি।

১২

বৈজ্ঞানিক উপনিবেশ ঃ আন্টার্কটিকা

দক্ষিণ গোলার্ধের প্রান্তসীমায় অবস্থিত আন্টার্কটিকাকে নিয়ে আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। কয়েক দশক হল সেখানে মানুষের পদার্পণ ঘটেছে। বিশ্বের কয়েকটি দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানোর জন্য কেন্দ্রও স্থাপন করেছে। অল্প সংখ্যক কুটিরে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জেগেছে, বরফরাজ্যের এই নিষ্করুণ পরিবেশে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে মানুষের এই যে প্রয়াস তা কি শুধুই অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ পাবার জন্য, কিংবা নিছকই কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের জন্য।

বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রহিসাবে আন্টার্কটিকার যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, আজ তা সকলে স্বীকার করেছে। সারা বিশ্বের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে দীর্ঘপ্রসারী জ্ঞানলাভের জন্য এই মহাদেশের আবহাওয়ায়, জলবায়ু, প্রাকৃতিক গঠন, জীবজগৎ, ইত্যাদির পুংখানুপুংখ অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। 1982 সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, "আন্টার্কটিকায় ভারতীয় অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল, ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে বৃষ্টিপাতের কারণ সঠিক উপলব্ধি করার জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেখানকার আবহাওয়া অনুসন্ধান করা।" যতক্ষণ ওখানে মানুষের উপস্থিতি গবেষণাস্তরে সীমাবদ্ধ, ততক্ষণ ওখানকার শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সেখানে দুর্মূল্য মানিকসম্পদের সঙ্গে অন্যান্য সম্পদের উপস্থিতির সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল বলে মনে করা হচ্ছে। যার অর্থকরী মূল্য নিতান্ত নগণ্য নয়। সে মহাদেশে এই সেদিন অবধি বাসিন্দা ছিল কিছু পাখি আর সামুদ্রিক প্রাণী, আজ সেটা বিশ্বের কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের দখলে থাকবে – এ নিয়ে মতান্তর ও মনান্তরের সুত্রপাত শুরু হয়ে গেছে। নিজেদের অর্থবল সম্বল করে যে যে দেশের লোক সাহস করে এখানে এসে ঘাঁটি বেঁধেছিল, বিশ্বের এই পঞ্চম বৃহৎ মহাদেশ ভোগ ও উপভোগ করতে পারবে কেবলমাত্র ওই মুষ্টিমেয় দেশ কিংবা তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পারবে শুধু তারাই! আন্টার্কটিকাকে কি সমগ্র মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে



চিত্র নং 12.1 ঃ আন্টার্কটিকার মানচিত্র

পায়নি ? গভীর সমুদ্র নিয়ে আন্তর্জাতিক সমঝোতার চেষ্টায় অনেকটা এগিয়ে যাওয়া গেছে, কিন্তু আন্টার্কটিকার সম্পদে কার অধিকার বর্তাবে, এ নিয়ে এখনও কুয়াশাই রয়েছে।

এ শতাব্দীর গোড়ায় দক্ষিণ-মেরুর এই মহাদেশের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ঘটেছিল মূলত অভিযাত্রীদের মাধ্যমে। 1908 থেকে 1942 সালের ভেতর আন্টার্কটিকার কোন না কোন অংশের অধিকার দাবি করে পৃথিবীর সাতটা দেশ। দক্ষিণ মেরুকে কেন্দ্র করে দুই ব্যাসার্ধের অন্তবর্তী কোন কোন বৃত্তাংশের মালিক বনে যেতে চাইল আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, চিলি, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড এবং সঠিক বৃত্তাংশের আকার নয় এমন একটা অঞ্চল নরওয়ে নিজের বলে দাবি করল। বিশ্বের আর কোন দেশই এইসব দাবিদাওয়া মেনে নিতে চাইল না। তাই এই মহাদেশের প্রশাসন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, এ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা গেল। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বর্ষে (International Geophysical Year, 1957-58) আন্টার্কটিকায় গবেষণারত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে, যার ফলে 1961 সালে আন্টার্কটিকা চুক্তির সম্পাদন।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে 12 টি দেশ। তারা হল আর্জেটিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, জাপান, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরপর আরও নটা রাষ্ট্র—চীন, ব্রাজিল, ভারত, ইতালি, পূর্ব জার্মানি, পশ্চিম জার্মানি, ডেনমার্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ড – এই চুক্তির পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা লাভ করেছে। মজার ব্যাপার, আন্টার্কটিকার একটি বিশেষ অংশের দাবিদার তিনটি দেশ– ব্রিটেন, চিলি ও আর্জেন্টিনা। বর্তমানে আন্টার্কটিকায় সবচেয়ে বেশি গবেষণা চালাচ্ছে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তারা কিন্তু এর কোন অংশকে নিজের বলে দাবি করেনি। এরা অন্যদের দাবিকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে। এর হয়ত কিছু কারণ থাকতে পারে। দক্ষিণ প্রান্তের এই মহাদেশের ভূখন্ড দখলের দৌড়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে তারা হয়ত দেখেছে যে বেশির ভাগ ভাল ভাল অঞ্চলই বেহাত হয়ে গেছে। তাছাড়া কারুর দাবি স্বীকার না করলে আইনগত ও নীতিগতভাবে অবাধ গতিবিধির প্রতিবন্ধকতা কে আর সৃষ্টি করবে ! 30 বছর মেয়াদের আন্টার্কটিকা চুক্তি শেষ হবে 1991 সালে।

এই চুক্তির ফলে বিভিন্ন দেশের দাবিদাওয়া আপাততঃ ধামা চাপা দেওয়া আছে। চুক্তির কোন এক সর্তে এ বিষয় আপাততঃ শিকেয় তুলে রাখার কথা উল্লিখিত আছে। আন্টার্কটিকা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল এই মহাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে গবেষণা চালানো

এবং এর জন্য প্রত্যেকটি স্বাক্ষরকারী দেশ যেন উদারভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এই চুক্তির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দেশ যে পরস্পরের মিত্র তা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার উভয়ের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সকলেরই জানা আছে। চিলি ও আর্জেন্টিনা দক্ষিণ আমেরিকায় তাদের ভূখণ্ডের সীমা নির্ধারণ নিয়ে কয়েক বছর ধরে বিবাদমান। ফকল্যাণ্ড ও দক্ষিণ জর্জিয়া দ্বীপের মালিকানা নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে আর্জেন্টিনার যুদ্ধ হয়ে গেছে এই দশকে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আন্টার্কটিকার কোন বৈঠকে এ নিয়ে কোনদিন কোন রোষ বা উষ্মা প্রকাশ পায়নি, বরং সৌহার্দ্যের পরিবেশই বরাবর বজায় ছিল। সদস্যরাষ্ট্ররা কঠোরভাবে চুক্তির সূত্রগুলো মেনে চলে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার এক আদর্শ দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছে।

জলবায়ু, প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, হিমবাহতত্ত্ব ইত্যাদির নিয়ে গবেষণা করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অবস্থান জানার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। অবশ্য বিভিন্ন কারণে এখানে খনির অনুসন্ধানের কাজ ভীষণভাবে সীমিত। 1961 সালে আন্টার্কটিকা চুক্তি প্রণয়নের সময় এখানকার সম্পদ সম্বন্ধে খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা



প্লেট নং 12.1 ঃ আন্টার্কটিকা

ছিল না। তার অনুসন্ধান সাঙ্গ করে তাকে এহেন প্রতিকূল পরিবেশ থেকে 30 বছরের মধ্যে যে আহরণ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না, এ রকম মনে করাই তখন স্বাভাবিক ছিল। গত 25 বছরের উদ্যোগের ফলে চিত্রপট কিছুটা স্পষ্ট হলেও, এখনও অনেক কিছু অনুমানের বিষয়। চুক্তি তো শেষ হয়ে এল। এখানকার অধিকারের দাবির সমাধানও এখনো হয়নি। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের আন্টার্কটিকাকে নিয়ে সচেতনা আজ অনেক বেড়ে গেছে। তাই আন্টার্কটিকার প্রশাসন এখানকার সম্পদ বন্টন ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক বিষয় নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। এই বিষয়ে আলোচনা সুত্রপাত করার আগে আন্টার্কটিকার সম্পদ সম্বন্ধে কতটা খবর মিলেছে, তা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক্।

আন্টার্কটিকার যে খনিজ সম্পদ অর্থকরী ভাবে মানুষের কাজে লেগেছে, তা হল সীল, তিমি ও ক্রিল। এখনও এখানে সীল শিকার চলছে। এককালে যথেচ্ছ ভাবে সীল শিকার করা হত, বিশেষ করে ফার সীল (fur seal)। নরম ফার খুব দামী বস্তু। ফার সীল নিধন এমন বেপরোয়াভাবে হত যে এখানে এর প্রজাতি প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে; উত্তর মেরুতে অবশ্য বিভিন্ন চুক্তিতে এদের হত্যা নিষিদ্ধ করে সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ানো হচ্ছে। আন্টার্কটিকায়ও সীল শিকারের পরিমাণ আজ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক তিমির বাসস্থান এই মহাদেশের সাগরে। এখানকার ক্রিল খেয়েই তারা জীবন ধারণ করে। বহুদিন থেকেই মানুষ তিমি শিকারে লিপ্ত। তিমির বংশবৃদ্ধির হার খুব মন্থর বলে তিমি শিকারীরা ভেসে বেড়িয়েছে এক সমুদ্র থেকে অন্যতে। 1893 সালে তাদের নজর পড়ে তুষারাবৃত এই মহাদেশের সাগরের উপর। তখন দক্ষিণ জর্জিয়া ও তার কাছাকাছি দ্বীপে কেন্দ্র স্থাপন করে এখানকার তিমি নিধনে তারা নেমে পড়ে। সাগরে তিমি মেরে তাদের কেন্দ্রে নিয়ে এসে সেখানে তেল বের করে নেওয়া হত এবং ওদের মাংস ও হাড় গুঁড়ো করে সার বানানো হত। কিন্তু মৃত তিমিকে টাগে করে তীরে টেনে নিয়ে আসা বেশ ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়েছিল।

1930 সালের কাছাকাছি তিমি-শিকারী জাহাজের (factory ship) উদ্ভাবন হল। তিমিকে তীরে টেনে আনার আর প্রয়োজন হত না। সাগর থেকেই উত্তোলকের সাহায্যে তাদের জাহাজে তুলে এনে সেখানে তাদের দেহ থেকে বিভিন্ন অংশ সংগৃহীত হত। সেখানকার হিমায়নযন্ত্রে (refrigerator) তিমির মাংস রক্ষিত থাকত। কিন্তু শিকারের নেশা মানুষকে যখন পেয়ে বসে, আর তার সঙ্গে যদি অর্থাগমের সুযোগ থাকে, তখন সে বিচারবুদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তাই একদিন দেখা গেল যে তিমির সংখ্যা অত্যন্ত কমে

গেছে। 1946 সালে আর্ন্তজাতিক তিমিশিকার সংস্থা (International Whaling Commission) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে লাগাম টানার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিমির সংখ্যা কমে আসতে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা গেল। তবে জাপান এবং রাশিয়া এই দুটি দেশ আন্টার্কটিকায় এখনও তিমি শিকার করে চলেছে।

আন্টার্কটিকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিজ সম্পদ ক্রিল। ওখানকার অনেক প্রাণীরই প্রধান খাদ্য ক্রিল। শক্তখোল যুক্ত এই জলজীব মানুষের খাদ্য হতে পারে। ওখানকার জলে এদের বিরাট সংখ্যায় অবস্থান। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতি না করেও বছরে 100 মিলিয়ন বা 10 কোটি টন মত ক্রিল সংগ্রহ করা যেতে পারে। খাদ্য ছাড়া অন্য কি উপায়ে এই জীবকে কাজে লাগানো যায় তা নিয়েও গবেষণা চলছে।

এখানে কয়লা আর আকরিক লোহা, এই দুটি খনিজ বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত থাকে বলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। ট্রান্স-আটলান্টিক পর্বতমালায় কয়লার অবস্থান, আর লোহার প্রাপ্তিস্থান মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে। অন্যান্য কিছু কিছু ধাতুর উপস্থিতির প্রমাণও পাওয়া গেছে, তবে উৎপাদনের উপযোগী পরিমাণে পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। এখানকার শিলাস্তরের আকৃতি, গঠন ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকা , দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার শিলাস্তরের অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকায় এখানে বিপুল খনিজ সম্পদ পাওয়ার আশা যোগাচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার উইটওয়াটার্সব্যাণ্ডের স্বর্ণখনি অঞ্চলের সঙ্গে আন্টার্কটিকার পশ্চিমে কুইন মাড স্থলভাগের, এবং দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের তামাসমৃদ্ধ আণ্ডেজের সঙ্গে আন্টার্কটিকা উপদ্বীপের অপেক্ষাকৃত নতুন পর্বতশ্রেণীর প্রচুর মিল। পশ্চিম আন্টার্কটিকার ডিউফেক আগ্নেয় অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বুশভেল্ড (Bushveld complex) অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা চলে। বুশভেল্টের মত সম্পদশালী খনি পৃথিবীতে নেই বললেই হয়। এখান থেকে আহৃত প্লাটিনাম, ক্রোমিয়াম, নিকেল, ফ্লোস্পার, টিন ও ভ্যানাডিয়াম বিক্রীর পরিমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত খনিজ পদার্থ বিক্রির 11.1 শতাংশ। আশা করা যাচ্ছে যে উপরোক্ত ধাতুগুলো পৃথিবীর এই শীতলতম মহাদেশে পাওয়া যেতে পারে। এদের মধ্যে প্লাটিনাম অত্যন্ত দুর্মূল্য। পৃথিবীর শতকরা 85 ভাগ প্লাটিনামের অবস্থান দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পরিবেশ দূষণ রোধে এই ধাতুর ভূমিকা এতই উল্লেখযোগ্য যে এর ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাই আন্টার্কটিকায় প্লাটিনামের স্থিতি জানা গেলে এবং তা আহরণ সম্ভব হলে, সমগ্র বিশ্বের উপর এর একটা প্রভাব

পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ভূতত্ত্ব ও ভূপদার্থবিদরা এ অঞ্চল বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করছেন।

আন্টার্কটিকা মহীসোপানে খনিজ তেলের প্রাপ্তিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তবে এখানকার সাগরে খননকার্য চালানো খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তাই প্রচুর তেল যেখানে উৎপন্ন হবে মনে করা যাবে সেখানেই শুধু খনন করা যেতে পারে। তেল অনুসন্ধানের কাজ এখানে চালানো হয়েছে। বড় বড় তৈল প্রতিষ্ঠান এখানে খননের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

আন্টার্কটিকার নিকটবর্তী দক্ষিণপূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর ও স্কটিয়া সাগরের তলে বহুধাতবীয় নুড়ির সন্ধান মিলেছে। স্থানে স্থানে এরা বেশ ঘনভাবে অবস্থান করছে। তবে অন্যত্র এ নুড়ি উত্তোলন এখনও আরম্ভ হয়নি। তাই এ ব্যাপারে আন্টার্কটিকার সাগরস্থিত নুড়িগুলো আরো বেশ কয়েক বছর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারবে।

সম্পদ আহরণ ছাড়া পৃথিবীর এই দূরতম মহাদেশে অন্যান্যভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা মানুষ কিছু কিছু ভেবেছে। আন্টার্কটিকাকে বিরাট হিমঘর হিসেবে ব্যবহার করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বিনা খরচায় এই প্রাকৃতিক শীতলতার সুযোগ নেওয়া তো বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে খুবই যুক্তিযুক্ত, কিন্ত হিসেব করে দেখা গেছে যে বিভিন্ন মহাদেশ থেকে এখানে পরিবহনের খরচা এতই বেশি যে এই পরিকল্পনা অর্থনৈতিক সাফল্য আনবে না। একই কারণে আন্টার্কটিকার বিশুদ্ধ অলবনাক্ত জলও সারা বিশ্ববাসীর কাছে এখনই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়।

ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহে আজ দুদশক ধরে এখানে পর্যটকদের আনাগোনা। 1950 সাল থেকে এখানে টুরিষ্ট শিল্প গড়ে উঠেছে। অধিকাংশই আসে জাহাজে, কেউ কেউ এরোপ্লেনে। পর্বত অভিযান বা স্কী করার পক্ষে আদর্শ এই মহাদেশ। এরা কখনো ঘুরে বেড়ায় বৈজ্ঞানিকদের কেন্দ্রে, কখনো বা দেখতে যায় পেঙ্গুইনদের প্রজনন স্থান। এখানকার অকরুণ আবহাওয়ার জন্য পর্যটন ব্যবসা খুব জমিয়ে বসবে বলে মনে হয় না। 31000 এর বেশি লোক আজ পর্যন্ত এখানে এসেছে তার মধ্যে 11000 জন প্লেনে। 1979 সালে দুর্ঘটনায় এখানকার 257 জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। পর্যটক আরোহিত পারাপারের জাহাজের দুর্ঘটনার সংখ্যাও কম নয়। এই অতিরিক্ত লোকের উপস্থিতি এ স্থানের আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কোন অনুসন্ধান আজও চালানো হয়নি। টুরিষ্টের সংখ্যা বাড়তে থাকলে এখানে ত্রাণ ও উদ্ধারের যথাযথ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত প্রশাসনিক উপায়ের

বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

এখানে খনিজ পদার্থের অবস্থিতি জানার পর তা উৎপাদন করার যদি বিশ্বব্যাপী সম্মতি মেলে, তবুও তা শুরু করতে কয়েক দশক লেগে যাবে। এ ব্যাপারে যে যে প্রতিবন্ধকতা আছে, তা হল ঃ 1) পৃথিবীর এক প্রান্তে সুদূরতম মহাদেশ আন্টার্কটিকার অবস্থিতি, 2) এখানকার নিষ্করুণ আবহাওয়া—পৃথিবীর শীতলতম তাপমাত্রা ও মাঝে মাঝে কয়েকদিনব্যাপী হিমঝঞ্ঝা, 3) স্থলের 98 শতাংশে ঘন বরফের আচ্ছাদন 4) অধিকাংশ খনিজের পৃথিবীর অন্যত্র সহজ লভ্যতা এবং 5) পরিবেশ সচেতকদের বিরুদ্ধতা। এই শীতল, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পরিবেশে, তুষারের আবরণ ছেদ করে উপযুক্ত প্রযুক্তি আরোপ করা যে একটা চ্যালেঞ্জ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুমেরু অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ মেরুর আবহাওয়ার কিছু সাদৃশ্য আছে। কয়েকবছর হল আর্কটিকে খনির কাজে মানুষ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সেখানকার 30টা খনির মধ্যে 11টার অবস্থান 70 ডিগ্রী অক্ষাংশের উত্তরে। সেখানে নিম্ন চাপের মধ্যে বরফের আচ্ছাদন ভেঙে খনির কাজ সুষ্ঠুভাবে চালু আছে এবং তা থেকে প্রচুর লাভও হচ্ছে। একই প্রযুক্তি সামান্য হেরফের করে আন্টার্কটিকায় আরোপ করা যেতে পারে। অর্থাৎ এই প্রতিকূল পরিবেশকে মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি গড়ে তোলা কোন সমস্যা নয়। সুমেরু অঞ্চলে খনি থেকে লাভ হওয়ার অন্যতম কারণ ওই খনিজ পরিবহনের ব্যয় খুবই কম। কানাডা, রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশ এর নিকটে অবস্থিত। কিন্তু আন্টার্কটিকাতে পরিবহন একটা বিরাট অর্থনৈতিক চাপের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। জাহাজে পরিবহন অপেক্ষাকৃত সস্তা পড়লেও, এখানে বরফ ভাঙা জাহাজের (icebreakers) সাহায্য প্রয়োজন হয়। একই দূরত্ব পারাপারে পৃথিবীর অন্যত্র যা খরচা পড়ে, এখানে তা প্রায় দশগুণ পর্যন্ত হতে পারে। আন্টার্কটিকার ম্যাক্‌মারডো স্টেশনে যদি জাহাজ বা প্লেনের জ্বালানি তেল নিতে হয়, তবে তার দাম পৃথিবীর অন্য জায়গার থেকে বেশ কয়েকগুণ বেশি হয়। তারপর মহাদেশের অন্তবর্তী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার দুরূহ সমস্যা তো রয়েছেই।

আন্টার্কটিকার পরিবেশ একদিন ছিল স্বচ্ছ এবং সন্দেহাতীতভাবে দূষণমুক্ত। মানুষের পদার্পণ, তার সঙ্গে অন্য স্থান থেকে বয়ে আনা খনির দাহ্য তেলের ধোঁয়া মহাদেশের চারপাশ কলুষমুক্ত রাখছে না। তারপর যদি এখানে বিভিন্ন শিল্প স্থাপিত হয়, তবে তো দূষণের পরিমাণ বেড়েই যাবে। সমস্ত পৃথিবীর উপরই এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে। পরিবেশ বিশারদদের একাংশ এখানে খননকাজের বা শিল্প স্থাপনের একান্ত বিরোধী। পৃথিবীর সব সাগর মহাসাগরের সঙ্গে

আন্টার্কটিকার চারিদিকের সাগর যুক্ত। তাই পৃথিবীর অন্যত্র দূষণের ছায়া এই মহাদেশের উপর অল্প অল্প পড়ে। এখানকার জলে ডিডিটি ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেছে। এখানকার তাপ বৃদ্ধি পেয়ে যদি বরফ গলতে শুরু করে, তবে পৃথিবীর বহু শহর জলের তলায় চলে যাবে। সমস্ত বিশ্বের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণে আন্টর্কটিকার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। বাস্তবিকই, পৃথিবীর আবহাওয়ার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দুই মেরুর উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয় ।

পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য আন্টার্কটিকাকে একটি আন্তর্জাতিক পার্কে পরিণত করার এবং এর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণএ একটা আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। তারা এ মহাদেশ শিল্পের ধোঁয়ায় কলুষিত করার পক্ষপাতী নয়। এ প্রস্তাবকে কেউ কেউ যেন বড্ড রক্ষণশীল বলে মনে করে। তাদের মতে, আন্টার্কটিকাকে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগালে দুনিয়া কিছু রসাতলে যাবে না। সুমেরু অঞ্চলে খনির কাজে যত দূষণ অনুমোদন করা গেছে, তার তুলনায় আন্টার্কটিকায় দূষণরোধের নিয়মাবলী যেন বড্ড পুঁথিগত ও বালখিল্য। উদাহরণ হিসেবে তারা প্লাটিনামকে বেছে নিয়েছে। প্লাটিনাম দীর্ঘ তাপমাত্রার মধ্যে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। তার এই বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাসের যেমন হাইড্রোকার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড ইত্যাদির হাত থেকে পরিবেশকে মুক্ত করার জন্য এদের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। উন্নত পশ্চিমী দেশগুলোতে দূষণের নিয়ন্ত্রণের আইন যত কঠোর হচ্ছে, এই দুর্মূল্য ধাতুর চাহিদা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই 1930 সালে বিশ্বব্যাপী যেখানে 5 টন প্লাটিনাম ব্যবহৃত হত, সেখানে এখন তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 90 টন। পৃথিবীর শতকরা 82 শতাংশের বেশি প্লাটিনাম আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। উন্নত দেশগুলো মূলত দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এই ধাতু আমদানি করে। যুক্তি অবতারণা করা হয়েছে যে আন্টার্কটিকার এই ধাতু যেখানে বিশ্বের পরিবেশকে কলুষ মুক্ত করতে পারে, সেখানে সেটার উত্তোলনে বেশি মনোযোগী না হয়ে, এই দক্ষিণান্তিক মহাদেশ এর ফলে দূষিত হয়ে যাবে বলে অযথা আশংকা প্রকাশ করা সমীচীন নয়। তাছাড়া আন্টার্কটিকতে প্লাটিনাম পেলে পশ্চিমী দেশগুলোর দক্ষিণ আফ্রিকার উপর অন্ততঃ এই ধাতুর ব্যাপারে নির্ভরশীলতা কিছু কমবে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারের উপর চাপসৃষ্টির পরিমাণ তখন বেশি হতে পারে।—গত দশকে এ রকমই ধারণা ছিল।

আগেই বলেছি এবছরই (1991 সালে) আন্টার্কটিকা চুক্তি শেষ

হবে। তার পরে আন্টার্কটিকার ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। এখানকার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান আজ বেড়ে গেছে সন্দেহ নেই, বিশেষ করে গড়ে উঠেছে পরিবেশের সঙ্গে মানুষ ও প্রাণিজগতের সহাবস্থানের সচেতনা। পৃথিবীর সর্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য নিরূপণে আন্টার্কটিকার এক বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস ইঙ্গিত করে যে আন্টার্কটিকায় মানুষের অবস্থান শুধুমাত্র গবেষণান্তরে সীমিত থাকবে না, এই মহাদেশকে অর্থকরীভাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে বেড়ে যাবে। কেন এটা হবে বুঝতে গেলে বিশ্বব্যাপী খনিজ পদার্থ সংগ্রহ ও খনির কাজে সমস্যাগুলো আগে জেনে নিতে হবে।

প্রথমতঃ, উন্নত দেশগুলো বহু কাঁচামাল আমদানির জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রকট এবং ঠিক সময়ে কাঁচা মাল যোগাড় করা মুশকিল হয়ে যায়। তাই উন্নত দেশগুলোর শিল্প অনেক সময়ই ব্যাহত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশে অতিরিক্ত কাঁচামাল থাকলেই যে তারা অন্য যে কোন দেশকে দিতে রাজি হবে—এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এ ব্যাপারে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, বিশ্বব্যাপী কাঁচামালের অসম বন্টন। উন্নত দেশগুলোর যে খনিজ সম্পদ আছে তার 90 শতাংশের অধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও সাউথ আফ্রিকা। সমাজতান্ত্রিক দেশের 80 শতাংশ রাশিয়াতে অবস্থিত। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশ খনিজ সম্পদ মাত্র কয়েকটি দেশে সীমিত— ব্রাজিল (25 শতাংশ), চিলি (9 শতাংশ), ইন্দোনেশিয়া (7 শতাংশ), জায়ের, পাপুয়া নিউগিনি ও ভারত (4 শতাংশ)। অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপ, জাপান, পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশ এবং শতকরা 70 ভাগ উন্নয়নশীল দেশেরই কোন খনিজ সম্পদ নেই বললেই হয়। কাঁচামালের মূল্য কখনই স্থিতি থাকে না। অধিকাংশ সময়ই দুটো শিল্পসমৃদ্ধ দেশ এই মাল সংগ্রহের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। 1973 সালে রাতারাতি খনিজ তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে বিশ্বের অর্থনীতির উপর কি প্রচণ্ড চাপই না পড়েছিল! চতুর্থতঃ পৃথিবীর কোন কোন স্থান খনির কাজের জন্য পরিবেশ দ্রুত দূষিত হয়ে যাচ্ছে।

তাই পৃথিবীর কোন নতুন স্থানে ধাতুর অবস্থান জানা গেলে বিশ্ববাসীর নজর তো সেখানে পড়বেই। 1980 সালের গোড়া থেকেই আন্টার্কটিকায় খনিজ দ্রব্য আহরণের উপায় নিয়ে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করা হচ্ছে। পরিবেশ দূষিত না করে কিভাবে খনির কাজ চালানো যায়, সে সম্বন্ধেও মতবাদের অভাব হয়নি।

সেই চিরায়ত প্রশ্নে ফিরে আসা যাক্ – আন্টর্কটিকার খনিজ সম্পদে কোন দেশের অধিকার থাকবে। গত দুদশকের বেশি ধরে আন্টার্কটিকা চুক্তি সাক্ষরকারী দেশগুলো এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানে রত। এই সম্পদ আহরণের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি গড়ে তোলার সামর্থ তাদের আছে। তাদের সম্পদ আহরণের সাফল্য মিললে তা সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাবে এক অনীহা দেখা দেওয়াই তো স্বাভাবিক। 1983 সালে বনে (Bonn) চুক্তিভূক্ত সদস্যদের এক বৈঠকে এখানে অনুসন্ধান বা উৎপাদনের জন্য একটি সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাদের মূল যুক্তি হল, যে মহাদেশকে এ কবছর তারা সযত্নে লালিত করে এসেছে, চুক্তিভূক্ত দেশগুলোর অন্তর্ভূক্তি হলে এখানকার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাহত হতে পারে। যারা এই মহাদেশে এল না, লাভ করল না বরফরাজ্যের কোন অভিজ্ঞতা, তাদের পক্ষে একে ঠিকমত রক্ষা করার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা আসবে কি করে!

চুক্তি বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলো কিন্তু নিজের স্বার্থরক্ষায় উত্তাল হয়ে উঠেছে। "সমুদ্রের আইনে"র খসড়া প্রণীত হবার পর তাদের জোর অনেক বেড়ে গেছে। গভীর সমুদ্রের মত আন্টার্কটিকাকেও সমগ্র মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তাই যে মহাদেশ যুগ যুগ



প্লেট নং 12.2 ঃ আন্টার্কটিকায় পেঙ্গুইন

ধরে জনমনুষ্য বিবর্জিত ছিল, তা মাত্র কয়েক বছর ধরে কয়েকটা বৈজ্ঞানিকের উপস্থিতিতে মুষ্টিমেয় কয়েকটা রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে যাবে, এ যুক্তি যেন কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না। আন্টার্কটিকা একটা ক্লাব ঘর হতে পারে না, যার বাইরে ঝোলানো থাকবে কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য" । তাছাড়া চুক্তিভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে তো দখলের দাবি নিয়ে এখনও মীমাংসা হয়নি । তাই সম্পদ উত্তোলন নিয়ে স্বার্থসংঘাত যখন ঘটবে, তখন এই বিবাদ যে আরও প্রকট হয়ে উঠবে না, তাই বা কে বলতে পারে । এ নিয়ে যুদ্ধ লাগার প্রশ্নও তো হেঁয়ালি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না । এর পরিবেশ যখন দূষিত হয়ে যাবে, যুদ্ধের জন্যই হোক্ বা সম্পদ আহরণের জন্যই হোক্, তখন তার মাশুল তো বিশ্বের সব রাষ্ট্রকেই দিতে হবে। নিজের স্বার্থ নিজেই যদি দেখা না গেল, তবে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ সারা বিশ্বের অভিভাবকের দায়িত্ব সঠিক পালন করবে, এ ধরে নিয়ে কি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায় !

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারতই প্রথম দেশ যে আন্টার্কটিকাকে সমগ্র বিশ্বের সম্পদ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব দেয় । সালটা 1956 । সে প্রস্তাব তখন বিশেষ পাত্তা পায়নি । সে সময় সাধারণ পরিষদের চরিত্র ছিল অন্যরকম । উন্নত দেশগুলোর, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তখন প্রবল দাপট ছিল । এখন রাষ্ট্রসংঘের চেহারা অনেক পাল্টে গেছে । তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো এখন যথেষ্ট মুখর । আন্টার্কটিকা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে । মালায়াশিয়ার প্রধান মন্ত্রী 1982 সালে 29শে সেপ্টেম্বর আন্টার্কটিকার শাসনের জন্য সমুদ্রের আইনের অনুরূপ এক আন্তর্জাতিক আইনের প্রস্তাব আনেন সাধারণ পরিষদে । জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রদের চাপে সাধারণ পরিষদে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে আন্টার্কটিকাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় 1982 সালের 21 সেপ্টেম্বর । পৃথিবীর 40 দেশ ওই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিল ।

তবে চুক্তি সাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে কোন কোন রাষ্ট্রের মত পাল্টাতে শুরু করেছে। বিশ্ব রাজনীতির যা চেহারা, তাতে মানবজাতির উত্তরাধিকার সূত্র যে আন্টার্কটিকার উপর আরোপ করা হবে, এ যেন দেওয়ালের লিখন। নিউজিল্যাণ্ড ও নরওয়ে তাদের দখলের দাবি ছেড়ে সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে আন্টার্কটিকাকে ভোগ করার স্বপক্ষে মত দিয়েছেন । তবে সমগ্র পরিস্থিতিটা এখনও যথেষ্ট জটিল । সমুদ্রের আইনের বিরোধিতা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আন্টার্কটিকার বেলায় নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে সবচেয়ে কঠোর মনোভাব তাদের । "সমুদ্র আইন" না মেনে তারা চারটে রাষ্ট্রকে নিয়ে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইছে, যার সাহায্যে তারা গভীর সমুদ্র থেকে সম্পদ তুলতে শুরু করবে । আন্তর্জাতিক

আইন নাকি এ ব্যবস্থা অনুমোদন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এহেন গতিবিধি আন্টার্কটিকার সম্পদ আহরণের উপায় নিরূপণের বিধিব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে, সন্দেহ নেই।

আন্টার্কটিকা মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ভারতের এটা একেবারেই অভিপ্রেত ছিল না। মানবজাতির উত্তরাধিকার সূত্রের অন্যতম প্রবক্তা আমাদের ভারত। অথচ এই দেশ আন্টার্কটিকা চুক্তির অংশীদার হয়ে অনেককে অবাক করে দিয়েছে। সে এখন এই চুক্তির পূর্ণ সদস্য। তৃতীয় বিশ্বের নেতা হয়ে অবশেষে সে কী নিজের নীতিকেই বিসর্জন দিল ? এ ব্যাপারে ভারতের যুক্তি হল তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সবচেয়ে অগ্রগণ্য দেশ হিসেবে এখানকার গবেষণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত না করে সে এগিয়ে এসেছে এই মহাদেশের বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে। আর তা করতে গেলে আপাততঃ 'ক্লাবের' সদস্য হওয়া ছাড়া উপায় বা কি ! এই মহাদেশের বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে ভারতের মত তো তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রদের থেকে আলাদা নয়। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রগত স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে সে কোন মৌলিক নীতির সঙ্গে আপস-মীমাংসা করেনি।

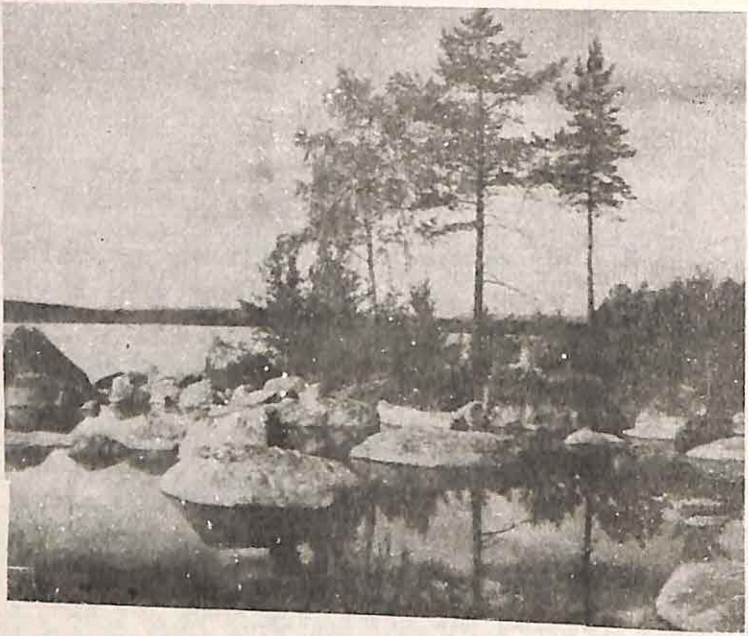
আন্টার্কটিকা চুক্তিভূক্ত ও চুক্তি বহির্ভূত রাষ্ট্রের স্বার্থ বজায় রেখে কোন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। তাই তো এই শান্তির মহাদেশ নিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী অশান্তির ঢেউ। রাষ্ট্রসংঘের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে একে নিয়ে আসার পেছনে আজ অনেক বাধা। তাই শান্তিপ্রিয় কোন কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করছেন, আন্টার্কটিকাকে কী শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের উপনিবেশ করে রাখা যায় না !

১৩

সামুদ্রিক দূষণ

বর্তমানকালের পরিবেশ দুষণের করাল হাত জল স্থল অন্তরীক্ষ সমস্ত স্থানেই পৌঁছে গেছে এবং সামুদ্রিক পরিবেশ দুষিত হওয়ার মাত্রা কিভাবে চলছে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। বহুরকম দূষিত দ্রব্য বিভিন্নভাবে সমুদ্রের জলে পড়ে। তটের কলকারখানা থেকে নিষ্ক্রান্ত নানা প্রকার জৈব পদার্থ, খনিজ তৈল ইত্যাদি সাগরের জলে মিশে তাকে দূষিত করে। প্রাকৃতিক নিয়মেও কখনো সখনো বহু আপত্তিকর জিনিস সাগরে এসে পড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠের ধাতু বৃষ্টির জলে প্রত্যক্ষভাবে বা নদী মারফৎ সাগরের জলে মেশে, মেক্সিকো উপসাগরে সাগরতলের তেল চুয়ে চুয়ে সাগর জলে মিশেই যাচ্ছে সমুদ্র তীরবর্তী ইংল্যান্ডের কয়লাখনিগুলি বারবার তরঙ্গে প্রতিহত হয়ে নিজেকে একটু একটু করে বিলিয়ে দিচ্ছে সাগরে, উষ্ণ প্রস্রবণের উপস্থিতি আইসল্যান্ডের কোন কোন অংশের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং ক্রমাগত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে চলেছে ব্রাজিল এবং ভারতের দক্ষিণপশ্চিম উপকূলের সমুদ্রে। প্রাকৃতিক কার্যকারণে সমুদ্রের জল কলুষিত হওয়া দূষণের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের দ্বারা সমুদ্রের পরিবেশ যদি এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে সামুদ্রিক প্রাণী বিপর্যস্ত বোধ করে, সাগরজল ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে যায়, সাগর থেকে আহৃত কোন বস্তু ব্যবহারে মানুষের শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সমুদ্রজলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়ে উঠে না, তবে সমুদ্রের এ রকম অবস্থাকে সামুদ্রিক দূষণ বলা হয়।

বায়ুমন্ডলের সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিক দূষণ পৃথিবীবাসীর কাছে এক বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। পরিবেশ দূষণ যেমন স্থলভাগের মানুষের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে, সমুদ্রের জল কলুষিত হলে তার ফল তেমন মারাত্মক না হলেও, এর কিছু কিছু দিক কিন্তু ভেবে দেখার মত। এই ক্ষতিকারক দ্রব্যাদির এক নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করার ক্ষমতা সমুদ্রের থাকে, তবে তার সীমা অতিক্রান্ত হলে সামুদ্রিক পরিবেশ দূষিত হয়ে ওঠে। দ্রুত শিল্পকরণ, গ্রাম থেকে শহরে জীবিকার সন্ধানে অগণিত মানুষের নিত্য আনাগোনা এবং জীবনযাত্রার দ্রুত মান উন্নয়ন সর্বত্র পরিবেশ দূষণকে ভীষণভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে



প্লেট নং 13.1 ঃ দূষণের ফলে এই শান্ত পরিবেশে জীবের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন

বিশ্বব্যাপী এক উদ্বেগের ছায়া পড়েছে, আর পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার জন্য একটা সচেতনা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

খনিজ তেলের জন্য সামুদ্রিক দূষণ জনসাধারণের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর কারণ অনেক। খালি চোখেই তেল ভাসতে দেখা যায়, সমুদ্রে স্নান করার সময় তা চোখে পড়ে সংবাদপত্রের রিপোর্টে বা দূরদর্শনের পর্দায় দুর্ঘটনার ফলে সাগরের জলে নিষ্কাশিত হওয়া তেলের ছবি সহজেই নজর কাড়ে।

প্রতি বছর 50 লক্ষ টন খনিজ তেল বিভিন্নভাবে সমুদ্রে এসে মেশে। এর একটা বিরাট অংশ আসে বিভিন্ন তৈলবাহী জাহাজ বা ট্যাঙ্কার থেকে। পশ্চিম এশিয়া নাইজেরিয়া, ভেনেজুয়েলা ও ইন্দোনেশিয়া থেকে অশোধিত তেল (crude oil) দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানের বিভিন্ন শোধনাগারে জাহাজ মারফৎ আসে। তেলমুক্ত করে ট্যাঙ্কার খালি অবস্থায় ফিরে যায় না। জাহাজকে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিমজ্জিত করবার জন্য সমুদ্রের জল তাতে ভরে নেওয়া হয়। কম্পার্টমেন্টের দেওয়ালের ও তলাকার তেল এই জলে

মিশে যায়। ভরণ কেন্দ্রে (loading terminal) তেল নিতে যাবার আগে এই জল সাগরেই ফেলে দেওয়া হয় এবং কম্পার্টমেন্টগুলোকে জলের প্রবল চাপে ভালভাবে ধুয়ে ফেলা হয়। জাহাজ আবার নতুন করে সাগর থেকে জল নিয়ে নেয়, অবশ্যই তা অনেক বিশুদ্ধ। তবে যে জল ট্যাঙ্কার থেকে সাগরে নির্গত হল, তা স্বভাবতঃই সমুদ্রকে আরও দূষিত করল। জাহাজের নিমজ্জনের জন্য এই অতিরিক্ত জলের ভারকে ব্যালাস্ট (ballast) বলে।

সাগরে পরিবহনের পরিমাণ যত বেশি হচ্ছে, তত দুটো জাহাজের সংঘর্ষের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে একটি যদি তৈলবাহী জাহাজ হয় এবং ক্ষতির আকার যদি ব্যাপক হয়, তবে প্রচুর পরিমাণ তেল সাগরে মিশে যায়। এরকম একটা দুর্ঘটনার কথা পরে আলোচনা করব। সাধারণতঃ বন্দরে যাতায়াতের পথে তীরের কাছে সরু প্রণালিতে (strait) এরকম সংঘর্ষ ঘটে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম্পার্টমেন্ট ভেঙ্গে তেল বেরিয়ে আসে না বটে, কিন্তু কিছু তেল উপচে জলে পড়ে যায়। আর যেহেতু এগুলি সংঘটিত হয় তীরের কাছে, তাই তটবাসী এতে প্রভাবিত হয়।

অনেক সময় অতিরিক্ত ভারের জন্য জাহাজের খালি জ্বালানি আধারে (fuel tank) জল নিতে হয়। বিশেষ করে প্রতিকূল আবহাওয়ায় এটার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে এই জল সাগরে ফেলে দেওয়া হয়।

তৈলবাহী জাহাজসহ প্রত্যেক জাহাজকে মেরামত ও কার্যোপযোগী রাখার জন্য জলহীন ডকে (dry dock) নিয়ে আসা হয়। এক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন ট্যাঙ্কারকে পুরোপুরি তেলমুক্ত করা। এই তেল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পৃথিবীর অনেক জলহীন ডকে নেই। তাই সেখানে আসবার আগে তাকে সাগরে ধুয়ে মুছে তেলহীন করা হয়।

সমুদ্রে তেল উৎপাদনের সময় অনেক সর্তকতা অবলম্বন করার পরও অল্প পরিমাণ তেল সাগরজলের সংস্পর্শে আসে। সাগরে তেলকূপ (oil well) খননের সময় কখনো সখনো অত্যধিক চাপে তেল ও গ্যাসের নির্গমন মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, একথা আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদ্‌গীর্ণ তেল সমুদ্রের বুক প্লাবিত করতে পারে। 1977 সালের এপ্রিল মাসে উত্তর সাগরের এক তৈলাঞ্চল থেকে এরকম এক ব্লো-আউট হয়েছিল এবং সাতদিনের ভেতর তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার আগে 20000 থেকে 30000 টন তেল সমুদ্রের জলে মিশে গিয়েছিল। 1980 সালের মার্চ মাসে মেক্সিকো উপসাগরে যে ব্লো-আউট হয়েছিল, তাকে বন্ধ করতে ন মাস লেগেছিল। এই সময়ে 350000 টন তেল বেরিয়ে এসেছিল।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও অল্প অল্প তেল সাগরের সঙ্গে মিশছে বিভিন্ন উপায়ে। এটা নিত্য ঘটে চলেছে সমুদ্রতীরের তেল আদানপ্রদান কেন্দ্রে, তৈল শোধনাগারে, বন্দরে, তীরবর্তী

কলকারখানায় যেখান থেকে নির্গত অসম্পূর্ণভাবে দাহ্য পেট্রল ও ডিজেল বৃষ্টির জলে ধুয়ে সাগরে পড়ছে। আপাতদৃষ্টিতে সমুদ্রের বিশাল পরিধির তুলনায় এদের অল্প বলে তুচ্ছ করার প্রবণতা জাগতে পারে। এ ধারণা কিন্তু নিতান্তই ভুল। অল্প অল্প তেল সমষ্ঠিগতভাবে বিশাল হয়ে ওঠে এবং তা সাগরকে যথেষ্ঠ পরিমাণে দূষিত করতে পারে। তবে সাবধানতা অবলম্বন করে এবং কিছু বিধিনিষেধ কঠোরভাবে প্রতিপালন করে এই দূষণের পরিমাণ অনেকটা কমানো যায়।

জলের চেয়ে হাল্কা বলে তেল সমুদ্রে পড়ে উপরে ভেসে ওঠে। তারপর হাল্কা পর্দার আবরণের মত বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিস্তারের হার নির্ভর করে তার বৈশিষ্ট্যের এবং তা কতটা পুরু তার উপর। হাল্কা তেল ভারী তেলের চেয়ে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায়। বাতাস প্রবাহের উপরও তা কিছুটা নির্ভরশীল। 1000 ঘন মিটার তেল এক ঘন্টার মধ্যে 300 মিটার ব্যাসের বৃত্তে এবং 2.5 মিটার গভীরতার রূপ নিয়ে নেয়।

খনিজ তেলের যে অংশ জলে দ্রবীভূত হয়, তার কিছু কিছু যৌগ সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর কাছে বিষময়। জলে স্থিরীকৃত উদ্ভিদের বেলায় দেখা গেছে সে খনিজ তেলের স্পর্শে তারা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দূষণের ফলে গাছের কুঁড়ি ফুল হয়ে বিকশিত হয় না। ফুল ফোটা অবস্থায় তেলের স্পর্শ লাগলে তার থেকে বীজ হয় না, আর বীজ অবস্থায় দূষণের মুখোমুখি হলে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। প্রাণিদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের ডিম ও শাবকরা। সমস্যাটা মূলত ইকোলজিক্যাল এবং এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

প্রাণীদের মধ্যে সামুদ্রিক পাখির ক্ষতির হার সবচেয়ে বেশি হয় তৈলদূষণের ফলে। এই কারণে প্রতি বছরই প্রচুর পাখি প্রাণ হারায়, তবে তার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া প্রায় সাধ্যাতীত। মৃত অবস্থায় তীরে ভেসে আসে অনেক পাখি, আবার অনেকে সমুদ্রেই তলিয়ে যায়। আশংকা প্রকাশ করা হচ্ছে যে বর্তমান হারে জল দূষিত হতে থাকলে, সামুদ্রিক পাখির সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পেতে থাকবে। তেল পাখির পালকগুচ্ছে প্রবেশ করে তাদের জল প্রতিহত করার ক্ষমতাকে নষ্ট করে। তখন জল পাখির পালক ভেদ করলে তার শরীর ও পালকের অন্তবর্তী হাওয়াকে সরিয়ে দেয়। এই হাওয়াই পাখির প্লবতা ও শরীরের উষ্ণতা যোগায়। তাই হাওয়া স্থানচ্যুত হলে পাখি আস্তে আস্তে সাগরে ডুবে যায়। সে যদিও বা কখনো ভেসে থাকতে পারে, কিন্তু উষ্ণতা কমে যাওয়ার জন্য নিম্নতাপস্থিতিতে (hypothermia) ভোগে এবং মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। অনেক সময় পালকগুচ্ছকে তেলমুক্ত করার জন্য তা বিন্যস্ত করে, কিন্তু তেল তারা গলধঃকরণ করে ফেলে। এতে তাদের পাকস্থলি, যকৃৎ ইত্যাদির বিভিন্ন রোগ

হয়। 1981 সালে জানুয়ারি মাসে স্কাগেরাকের তটে 30000 মৃত সামুদ্রিক পাখি পাওয়া গিয়েছিল। দুটো জাহাজ থেকে অল্প পরিমাণ তেল নিষ্কাশনের বলি হয়েছিল এত বিশাল সংখ্যক পাখি। দূষণে পরোক্ষভবে প্রভাবিত হয় পাখিদের প্রজনন। যে সব পাখি সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তারা হল অ্যক (auk), ডুবুরি পাখি, গিলিমট (guillemot), দীর্ঘচঞ্চু বিশিষ্ট পাফিন (puffin), রেজারবিল (razorbill), সামুদ্রিক হাঁস, কোমল পালক অ্যাইডার (eider) এবং স্কোটার (scoter)।

তেল বা অন্যান্য তৈলাক্ত দ্রব্য যদি জলে ভাসে, তবে বাতাস ও জলের অন্তবর্তী এলাকায় অক্সিজেনের আদানপ্রদান সম্ভব হয় না। তাই জলের প্রাণিদের শ্বাসকার্য চালনোর সমস্যা দেখা যায়। দ্রুতগতি জলচর প্রাণী বিপদ বুঝে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সমুদ্রের অন্যস্থানে পালিয়ে যায়। কিন্তু চিড়িংমাছ জাতীয় কঠিন খোলযুক্ত ধীরগতিসম্পন্ন প্রাণী এবং জোয়ার-ভাঁটার মধ্যেকার তটবর্তী প্রাণী এহেন দূষণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে তৈলদূষণে সীলশাবকদের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, কিন্তু অন্যরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তবে যে সব এলাকায় সারা বছর ধরেই সমুদ্রের জল তেলের জন্য দূষিত হয়, সেখানকার মৎস্য জাতীয় প্রাণিদের বিভিন্ন রোগ দেখা গেছে। সাধারণতঃ তেল থেকে এদের টিউমার ও পাখনার ক্ষয় হয়ে থাকে।

তৈলাক্ত সমুদ্র মানুষের স্বাস্থ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে দেখা যাক। সমুদ্রতটের কাছাকাছি তৈলাক্ত হলে তরঙ্গের সঙ্গে তেলমাখা জল বারবার তটে আঘাত করে। কিছু ক্ষেত্রে সমুদ্রতীর বহুদিন অবধি তৈলাক্ত থেকেছে। খাদ্য হিসেবে মাছ সহ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীকে মানুষ খেয়ে থাকে। তবে যদি শুধু তেলে এ প্রাণীর শরীর দূষিত হয়, তবে তা মানুষের পক্ষে খুবই অল্প পরিমাণে ক্ষতি করে।

নদীর জলে প্রচুর পরিমাণে তেল থাকার জন্য তার থেকে আগুন লেগে যেতে পারে। ওয়িহোর কুয়াহোগা নদীতে (Cuyahoga) একবার এই কারণে আগুন লেগেছিল। সমুদ্রের তটে ভাসমান তেলের পরিমাণ বেশি হলে, পর্যটকদের ভিড় কমে যায়। আবার যদি তটের কাছে তেমন দুর্ঘটনা ঘটে যাতে জলে প্রচুর তেল নিঃসৃত হয়, তা দেখবার জন্য পর্যটকেরা দলে দলে আসতে পারে।

দুর্ঘটনার ফলে খনিজ তেল সমুদ্রে পড়ে গেলে সীমিত পরিধির মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখার বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালালেও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কোন একটা আরোপ করে দূষণকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সমুদ্রতট থেকে তেল পরিষ্কার করা শক্ত, সময় ও খরচসাপেক্ষ

এবং এতে প্রচুর শ্রমিকের দরকার হয়। তাই ভাসমান থাকাকালীন তেলকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা উচিৎ।

তেল সরানোয় বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। একটা হল তেলের সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ ঘটানো। এতে ক্রিয়াবিক্রিয়ায় উদ্ভূত যৌগ জলের থেকে ভারি হয় এবং তা ধীরে ধীরে সাগরতলে চলে যায়। এর একটা অসুবিধে হল ওই রাসায়নিক ফেলার জন্য বহু জলযানকে নিযুক্ত করতে হয়।

তাছাড়া আশঙ্কা, এই ভারী পদার্থ আবার হাল্কা হয়ে ওপরে ভেসে উঠে এবং তার ফলে মাছ ধরার যন্ত্রকে ঠিকমত কাজ করতে দেবে না।

বাস্তব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেও তেলকে জলে ছড়িয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। ভাসমান বেলনাকার বস্তুর সঙ্গে পর্দা টাঙ্গিয়ে তেলের প্রবাহকে রোধ করার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় তেলের বাইরের পরিধির দিকে রাসায়নিক পদার্থ যোগ করে পরিসীমা বরাবর তেলকে শক্ত আকার ধারণ করিয়ে তার স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

তেলকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব হলে সমুদ্রের জল থেকে তেলকে সরিয়ে দেবার প্রশ্ন দেখা দেয়। এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। তেলকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে অনেক সময় তেলের দাহ্য অংশ বাতাসে উবে যাওয়ায় তাতে আগুন দেওয়া সমস্যাসংকুল হয়ে ওঠে। তীরের কাছে এভাবে আগুন লাগালে সেখানকার ঘরবাড়িতে তা ছড়িয়ে পড়বার আশংকাও থাকে। অপেক্ষাকৃত স্থির জলে তেল পড়ে থাকলে শোষণের নল ব্যবহার করে তাকে অন্যপাত্রে চালান করার চেষ্টায় কিছু সফলতা মিলেছে।

তেলকে বেল্টের দ্বারা শোষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বেল্টে এমন দ্রব্য লাগানো থাকে যার সংস্পর্শে এসে তেল তার গায়ে আটকে যায়। তারপর বেল্ট উপরে উঠিয়ে এনে ওই তেলযুক্ত দ্রব্য মুছে ফেলা হয়। এছাড়া আরও নানা উপায়ে সাগরকে তেলমুক্ত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু সবকটা ব্যবস্থাতেই কিছু না কিছু অসুবিধে থেকে গেছে।

1967 সালের 18ই মার্চ টোরে ক্যানিয়ান নামে এক তৈলবাহী জাহাজ থেকে 120000 টন তেল সমুদ্রে পড়ে যায়। দুর্ঘটনা ঘটেছিল ইংল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলের কাছে। বাঁধনহীনভাবে এই তেল ধেয়ে চলল তিন দিকের স্রোতের উপর ভর করে। 30000 টন তেল ইংলিশ চ্যানেল বেয়ে ফ্রান্সের উত্তর তটে আছাড় খেল। 20000 টন পশ্চিম কর্নিশ উপকূলে হাজির হল, আর বাদবাকি তেল বিস্কে উপসাগরের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকল। এর ফলে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হল। এই তেলের বহমান স্রোতকে

নিয়ন্ত্রণে আনা এবং বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে দূষণকে রোধ করার প্রয়াস চলে।

তেলের এই প্রবাহের ফলে যেসব বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি সংঘটিত হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সামুদ্রিক প্রাণীর প্রাণহানি। এর ফলে প্রায় 12000 সামুদ্রিক পাখির মৃত্যু হয়েছিল। অন্যান্য জলচর প্রাণীর ক্ষয়ক্ষতির কোন হিসেব পাওয়া যায়নি।

সমস্ত পৃথিবী জুড়েই সাগর মহাসাগরের জল কিছু পরিমাণে তেলে দূষিত। তবে এদের মধ্যে সামগ্রিক ভাবে বোধ হয় ভূমধ্যসাগর সবচেয়ে দূষণযুক্ত। এর পশ্চিম ও উত্তরদিকে দূষণ সর্বাধিক। 2965000 বর্গমিটার জায়গা জুড়ে থাকা এই সাগরের সঙ্গে আটলান্টিক সাগরের সংযোগ সরু জিব্রাল্টর প্রণালী দিয়ে। জোয়ার ভাঁটার প্রভাব এখানে অল্প, তাই দূষিত পদার্থের ধুয়ে স্থানান্তরিত হবার সম্ভাবনাও কম। ভূমধ্যসাগরের পুরোটা নতুন জলে (আটলান্টিক থেকে বয়ে আসা) ভরে যেতে 80 বছর লাগে। পশ্চিম রাশিয়ার দেশগুলোর নিকটবর্তী হওয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি তৈলদূষণ এই জলে। স্থানে স্থানে পর্যটকদের স্নান করা নিষিদ্ধ। এর তীরবর্তী দেশের সংখ্যা 18 এবং তাদের অর্থনৈতিক বৈষম্য যেন বড় বেশি। তাই অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলো সামুদ্রিক দূষণ সম্বন্ধে সচেতন হলেও, গরীব দেশগুলোর মধ্যে এব্যাপারে বেশি সাড়া জাগেনি। অবশ্য দূষণের সমস্যা ভূমধ্যসাগরের স্থানে স্থানে কেন্দ্রীভূত, তাই স্থানীয়ভাবে মনোনিবেশ করেই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা যুক্তিযুক্ত।

তটসমীপবর্তী বিভিন্ন কলকারখানা থেকে রাসায়নিক পদার্থ, নর্দমার আবর্জনা, এবং বিভিন্ন প্রকার পরিত্যাজ্য পদার্থ সাগরের জলে নিষ্কাশিত হয়। এর কিছুটা গ্রহণ করার ক্ষমতা সাগরের থাকে। তাই কি হারে বা কি পরিমাণ আবর্জনা বিকীর্ণ হবে তা নির্ভর করে সাগরের ঢেউ, জোয়ার ভাটা, স্রোত ও বাতাসের গতির উপর। হিসেব করে বলে দেওয়া হয় জলে আবর্জনা ত্যাগের সর্বোচ্চ সীমা। তারপর সমুদ্রের জল থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। আজকাল সাগর থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। দূরানুভূতি পন্থার (remote sensing) ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। বিমান ও উপগ্রহের সাহায্য নিয়েও তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

এই সমস্ত পরিত্যক্ত আবর্জনার জৈব পদার্থে থাকে বিভিন্ন রকমের রোগজীবাণু। তাই এতে খাদ্য বা পানীয় জল দূষিত হলে মানুষের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সমস্যার উদ্ভব হবে। সমুদ্রের জল মানুষ পান না করলেও, সাঁতার কাটার সময় অনেক ক্ষেত্রে এই জল পেটে চলে যেতে পারে। জীবাণুপূর্ণ জৈব পদার্থ সামুদ্রিক মাছের শরীরে প্রবেশ

করে। মানুষ সেই মাছ খেলে তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। এই ধরনের সামুদ্রিক মাছে তটবাসীরাই শুধু ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাই নয়, চালানির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশের লোকেদেরও ক্ষতির মাসুল গুণতে হতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন তটে কিছু কিছু কলকারখানা রয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় সারকারখানা তো টুটিকোরিনের সমুদ্রতীরে। এ জায়গাটা শুধু মাছ চাষেরই একান্ত উপযোগী নয়, এখানকার সাগরে ডুবুরিরা নামে মুক্তো সংগ্রহের জন্যও। এই সারকারখানা থেকে নানারকম আবর্জনা ও ময়লা জল প্রতি ঘন্টায় 690 ঘনমিটার হারে নির্গত হত। নিঃসৃত পদার্থের মধ্যে প্রধান হল অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া এবং ফসফেট। তটরেখার জলের উপরিভাগে 50 মিটার দৈর্ঘ্যে তাদের নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখা হল। কিন্তু আবর্জনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে বিভিন্ন দূষিত দ্রব্য যে হারে সমুদ্রের জলে পতিত হচ্ছে, তা নির্ধারিত চরমসীমা থেকে অনেক বেশি। এদিকে আবার টুটিকোরিন বন্দরে বাঁধ দেবার জন্য আবর্জনা দ্রুত প্রবাহিত জলে নিষ্কাশিত হবার সম্ভাবনা কমে গিয়েছিল। তাই টুটিকোরিনের সমুদ্রতীর দূষিত হতে শুরু করেছিল। সমস্ত রকম পরীক্ষানিরীক্ষা ও তথ্য অনুসন্ধানের পর দূষণ রোধ করার জন্য তীর থেকে 300 মিটার গভীরে আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়।

1950 সালের গোড়ার দিকে জাপানের মিনামাটা উপসাগরের তটে এক রাসায়নিক কারখানা উৎপাদন করতে শুরু করে। তাদের পরিত্যাজ্য সব দ্রব্য উপসাগরে এসে পড়ত। এর তীরে বাস করত কয়েক হাজার জেলে। এদের প্রধান খাদ্য ছিল চিংড়ি, শামুক সহ বিভিন্ন ধরনের মাছ। দেখা গেল যে কারখানা চালু হবার পর থেকে এরা একটা অজানা এবং প্রচণ্ড কষ্টদায়ক অসুখে ভুগতে শুরু করছে। প্রায় 10000 লোক অসুস্থ হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই মারা গিয়েছিল।

পরে সাগরের জলের ও সামুদ্রিক প্রাণীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে কারখানা থেকে নির্গত হয়ে সাগরে পতিত পদার্থের মধ্যে অ্যাসিটেলডিহাইড (acetaldehyde) থেকে বিষক্রিয়া হয়েছিল। এই বিষ মাছেদের শরীরে প্রবেশ করেছিল। তা খেয়ে জেলে ও তাদের পরিবারের লোকেরা অসুস্থ হচ্ছিল। এই অসুখের নামকরণ হয়েছে মিনামাটা রোগ।

ডিডিটি ব্যবহার করে আমরা ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করি। 1940 সাল থেকে সারা বিশ্বে তার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। আজ সব সাগরের জলেই ডিডিটি পাওয়া যায়, এমনকি সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলের সাগরও বাদ যায়নি। কিছু কিছু ক্ষুদ্র পতঙ্গের শরীরে ডিডিটি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা গড়ে

উঠেছে। অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির পতঙ্গরা ছোটদের খেয়ে ফেলে। তারা আবার মাছেদের খাদ্য হয় এবং সামুদ্রিক পাখিরা এই সব মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে। এদের মধ্যে পেলিক্যান, করমোরান্ট ইত্যাদি কিছু শ্রেণীর সংখ্যা ভীষণ কমে যেতে থাকে। তাই 1970 সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র সহ অনেক পশ্চিমী দেশ ডিডিটি ব্যবহার হয় নিষিদ্ধ, না হয় সীমিত করেছে।

শরীরে কিছু কিছু ধাতুর প্রবেশ আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকারক বলে মনে হলেও, সাগরের জলে তামা, সীসা ইত্যাদির উপস্থিতিতে তেমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় না। সাগরজল তেজস্ক্রিয়, এতে আছে পটাশিয়াম−40। তাছাড়া এতে পাওয়া যায় ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাগরের বুকে বহু পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। সাগরতীরের পরমাণু শক্তিকেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে পড়তে পারে। বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা বর্তমান তা মানুষের ক্ষতি করে না, কিন্তু সাগরের ওই পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তায় ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তাই সাগরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিষ্কাশনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে অনেক দেশে।

পাশ্চাত্য দেশগুলোর মত সামুদ্রিক দূষণের সমস্যা ভারতে এখনও তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি। তবে দূষণের হার বছর বছর বেড়েই চলেছে। অন্তর্দেশীয় জলযানের নিয়ত যাতায়াতের ফলে দেশের বহু নদী দূষিত হয়ে গেছে। সে জল পান করা মানে তো শরীরের বিপত্তি ডেকে আনা। জলপথের এই দূষণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ভারতে আইন পাশ হয়েছে 1974 সালে। রাজ্য ও কেন্দ্র পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব এই আইনের ধারাগুলি বাস্তবে পরিণত করা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা এখনও তেমন সুষ্ঠভাবে কার্যকর হয়নি।

আন্তর্জাতিক সংস্থা IMCO (Inter-Governmental Maritime Consulative Organisation) তেল সংক্রান্ত দূষণ রোধের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। জাহাজ যেহেতু এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করে, তাই অনেককিছুই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন কাজকর্মের সময় জাহাজ থেকে সহজে যাতে তেল নিষ্ক্রান্ত না হয়, তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয় জাহাজে বানানোর পর্ব থেকে। এইসব খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দেবার জন্য জাহাজ তৈরির খরচ অনেক বেড়ে যায়। উন্নত দেশগুলোর পয়সার অভাব নেই, কিন্তু এইসব আইনের ধারা বিস্তারিত ভাবে মেনে জাহাজ নির্মাণ করা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছে ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে।

সামগ্রিকভাবে সামুদ্রিক দূষণ অত্যন্ত জটিল সমস্যা। সমস্যা দেখা

দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার সমাধান সম্ভবও নয়। সারা পরিবেশে প্রাণীরা পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ভরশীলও বটে। তাই কোন কিছুর অভাব দেখা দিলে বা কোন কিছু বিকৃত হতে থাকলে, প্রাণিজগতে চক্রাকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। তাই দূষণরোধের কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে হলে সমগ্র পরিবেশকে একটা ফ্রেমে সাজিয়ে নিতে হবে। তার সুদূর প্রসারী ফল সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। তাই সমস্ত ব্যাপারটাই সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে। ইকোলজিকাল সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা না করে গবেষণার মাধ্যমে আবর্জনা নিক্ষেপের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে, সেইগুলোকে আইন করে মানাতে বাধ্য করানো মূল্যহীন হয়ে যাবে।

পুনঃ—1991 সালের গোড়ায় উপসাগরীয় যুদ্ধে যে পরিমাণ তেল পড়ে সমুদ্র দূষিত হয়েছে তা এককথায় নজিরবিহীন। বিবাদমান উভয়পক্ষই একে অপরের উপর দোষারোপ করেছে এই দায়িত্বহীন কাজের জন্য। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তাতো হয়েই গেছে। আজ অবধি বিশ্বে জঘন্যতম তেলদূষণ ঘটেছে আলাস্কার প্রিন্স উইলিয়াম সাউণ্ডে 1989 তে। এক্সনের ভ্যালডেক্স ফিল্ড থেকে 260000 ব্যারেল তেল সাগরের জলে পড়ছিল। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধের আরম্ভের দু সপ্তাহের মধ্যেই 1100000 ব্যারেল তেল ভাসতে দেখা গিয়েছিল। ওই সময়ে বিশেষ কোন একদিনে এই ভাসমান তেলের মাপ ছিল লম্বায় 35 মাইল এবং প্রস্থে 10 মাইল।

পারস্য উপসাগরে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাখিরা। সেখানকার সামুদ্রিক পাখি শঙ্খচিল, গ্রেবেস, স্কোটার এবং করমোরান্টরা ঝাঁকে ঝাঁকে মারা গেছে। শেষোক্ত পাখি বিশ্বের একমাত্র এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। এ যুদ্ধে তেলযুক্ত জল লবণমুক্ত জল পাবার সরঞ্জামের ক্ষতি করেছে। এর মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বৃটেন থেকে সৌদি আরবে আমদানি করতে হয়েছিল।

সাগরজল তেলমুক্ত করার চিন্তাভাবনা অব্যাহত আছে। একেবারে আধুনিক যে উপায় বের করা হয়েছে তা হল সুপারবাগ দিয়ে কাজ সাঙ্গ করা। এরা এক ধরনের জীবাণু যার নাম মাইক্রোবিয়াল সারফাকট্যান্ট। তেলের উপর রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালাতে এরা সিদ্ধহস্ত। এই জীবাণু প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, একে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করতে হয়। হাইড্রোকার্বন অণুকে ভেঙ্গে দিতে এরা সক্ষম। এটা তাকে প্রোটিনে পরিণত করে, আর তা হয় সামুদ্রিক প্রাণীর খাবার। এটা অবশ্য এখনো গবেষণাস্তরে। বাস্তবে কোন ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

পরিশিষ্ট

ব্যবহৃত পরিভাষা

অগ্রগণ্য বিনিয়োগী	–	pioneer investor
অগ্নিস্পনজ্	–	firesponge
অঙ্গার	–	carbon
অর্ধভাসমান জাহাজ	–	semisubmersible vehicle
অবয়ব	–	structure
অভিকর্ষীয় ত্বরণ	–	acceleration due to gravity
অভিঘাত তরঙ্গ	–	shock wave
অশোধিত তেল	–	crude oil
আড়াআড়িভাবে	–	transversely
আবরণ পাইপ	–	conductor pipe
ইঁদুর মাছ	–	rat fish
উড্ডয়ন তথ্য যন্ত্র	–	digital flight data recorder
উত্তোলক	–	derrick, crane, winch
উত্তোলন	–	heaving
উদ্‌যান	–	oxygen
উপকূলরক্ষীবাহিনী	–	coast guard
উপগ্রহ	–	satellite
উভচর	–	amphibian
উল্লম্ব	–	vertical
ঋজু বস্তু	–	rigid body
কুণ্ডয়ন	–	scabies
কানেস্তরা	–	canister
কপাটিকা	–	valve

কম্পনাঙ্ক	–	frequency
কর্ষিকা	–	tentacle
ক্রান্তিবৃত্ত	–	tropical
খনন	–	drill
খননবিশারদ	–	driller
গুণটানা নৌকা	–	tug
গ্রীষ্মমণ্ডলীয়	–	tropical
ঘড়ির কলকব্জা সম্বলিত যন্ত্র	–	clockwise device
ঘূর্ণন	–	rotation
চাপবর্ধনী যন্ত্র	–	compressor
চাপস্বাভাবিকরণ পীড়া	–	decompression sickness
চালক ধ্বনি নির্ধারক যন্ত্র	–	cockpit voice recorder
জীবনরক্ষাতরী	–	lifeboat
জলরোধক বেষ্টনী	–	bulkhead
জলস্তর	–	water level
জলহীন ডক	–	dry dock
জাহাজের খোল	–	hull of a ship
জ্বালানি আধার	–	fuel tank
ডুবুরি	–	diver
ডুবো জাহাজ	–	submarine
ডুবোযান	–	submersible
তলোয়ার মাছ	–	sword fish
তারা মাছ	–	star fish
তিমিশিকারী জাহাজ	–	factory ship
তেজস্ক্রিয়	–	radioactive
তেলকূপ	–	oil well
তেল-গ্যাস নির্গমন প্রতিরোধক	–	blowout preventer (BOP)
তৈলখনন জাহাজ	–	drill ship
ত্রাণকূপ	–	relief well
দখলযন্ত্র	–	grab
দূরানুভূতি পন্থা	–	remote sensing
দূষণ	–	pollution
দৈর্ঘ্যদোলন	–	pitching

নিম্নতাপস্থিতি	–	hypothermia
নির্দেশক পাইপ	–	conductor pipe
নোঙর	–	anchor
নৌ-স্থপতি	–	naval architect
পরিশোধক	–	purifier
পলক ভাঙা	–	brittle fracture
পাইলটকক্ষ	–	cockpit
পাকাল	–	eel
পাটাতন	–	deck
পাথুরে মাছ	–	stonefish
পালকগুচ্ছ	–	plumage
প্রবাল	–	coral
প্রস্থদোলন	–	rolling
প্লবতা	–	floatation
বক্ষফলক	–	breast plate
বরফভাঙা জাহাজ	–	icebreaker
বহির্গামী হাওয়া	–	exhaust air
বহুধাতবীয় নুড়ি	–	polymetallic nodules
বাতাস তথ্য গণক	–	air data computer
বায়ুমণ্ডল	–	atmosphere
বিছে মাছ	–	scorpion fish
বিদ্যুৎরশ্মি	–	electric fish
বিপদ সঙ্কেত	–	distress signal
বেড়াল মাছ	–	catfish
বেলনাকার	–	cylindrical
ব্যাঘ্র হাঙর	–	tiger shark
ভরণ কেন্দ্র	–	loading terminal
মঞ্চ	–	platform
মনুষ্যরহিত	–	unmanned
মৎস্যশিকারতরী	–	fishing trawler
মাদুর-আলম্বিত	–	mat supported
মাস্তুল	–	mast
মহীসোপান	–	continental shelf

যান্ত্রিক হাত	–	mechanical arms
রজ্জু মৎস্য	–	stingray
রণতরী, যুদ্ধজাহাজ	–	warship
শল্যচিকিৎসা	–	surgery
শ্বেত হাঙর	–	white shark
শোধনাগার	–	refinery
সংযোগস্থল	–	joint
সঙ্কেত গ্রাহক যন্ত্র	–	transponder
সঙ্গরোধ	–	quarrantine
সরবরাহ তরী	–	supply vessels
সমুদ্র-গর্ভ	–	seabed
সমুদ্রপীড়া	–	sea sickness
সমুদ্রশল্লকী	–	sea urchin
সমুদ্রের আইন	–	The Law of the Sea
সাগর ভীমরুল	–	sea wasp
সামুদ্রিক দূষণ	–	marine pollution
স্তম্ভ	–	column
স্থপতি	–	architect
স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সীমা	–	Exclusive Economic Zone (EEZ)
স্মৃতি	–	memory
হিমঝঞ্ঝা	–	blizzard
হিমবাহ	–	glacier
হিমায়নযন্ত্র	–	refrigerator

লেখার উৎসসূচি

বিভিন্ন পুস্তক, প্রবন্ধ ও সংবাদপত্রের খবর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই বইয়ের বিভিন্ন রচনা লেখা হয়েছে। কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের মধ্যে মূল উৎসগুলোর নাম নিচে দেওয়া হল। সব আলোকচিত্রগুলোই নীচের কোন না কোন প্রকাশনার সৌজন্যে।

1) John J Myers, C H Holm and R F McAllister, Handbook of Ocean and Underwater Engineering, McGraw Hill Book Co. 1969.

2) B W Halstead, Dangerous Marine Animals, Cornell Maritime Press, Cambridge, USA, 1959.

3) Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica Inc., 1983.

4) Peter Kemp (Editor), The Oxford Companion to Ships and the Sea, Oxford University Press, 1976.

5) J M Waters, Jr., Rescue at Sea, D Van Nastrand Co. Inc, 1967.

6) D A Koster, Ocean Salvage, Gerald Duckworth & Co. Ltd, London, 1971.

7) T Mckenzie, "Marine salvage in peace and war", The Institution of Engineers and Shipbuilders in Scotland, V. 93, Paper No 1122, 1950.

8) A K Malhotra, Ocean Science and Technology, National Book Trust, India, 1980.

9) Proceedings of First Indian Conference in Ocean Engineering, IIT, Madras, 1981.

10) Journal of Indian Shipping, v 37, No 718, 1985.

11) Science Today, September 1985

12) L Cuyvers, Ocean Uses and Their Regulations, John Wiley and sons, 1984.

13) Samudra Manthan, Oil and Natural Gas Commission, 1981.

14) Draft Committee Resolutions of the Third United Nations Conference on The Law of the Sea, June 1982.

15) K C Barnaby, Some Ship .Disasters and Their Causes, Hutchinson of England, 1970.

16) Seminar on Frontier Technologies in the Third World: Towards a Strategy of Self-reliance, National Institute of Science, Technology and Development Studies, New Delhi, Dec 15-18, 1982.

17) G Vossers, Behaviour of Ships in Waves, The Technical Publishing Co., H-Stam, N. V, 1962.

18)F Rushbrook, Fire Aboard, Brown Son & Ferguson, U. K, 1979.

19) J Harvey-Evans and J C Adamchak, Ocean Engineering Structures, M I T Press, Cambridge, 1969.

20) A J Schlosser and L K Brady, "Ten years of operational experience with CURV III," Proceedings of Offshore Technology Comference, Houston OTC 4180, 1982

21) D E Tracy and J R Vadus, "Salvage and recovery of the OTEC I cold water pipe," Proceedings of the offshore Technology Conference, Houston, OTC 4557, 1983.

22) R Traggart (Editor), Ship Design and Construction, The Society of Naval Architects and Marine Engineers, USA, 1980.

23) A M D' Archengelo, Ship Design and Construction, The Society of Naval Architects and Marine Engineers, USA, 1969.

24) M Mukhopadhyay and S Bhattacharya, "Offshore Drilling and Production Platforms," Chemical Age of India, Vol 35, No 8, August 1984.

25) The Times of India: 29 May to 29 August 1982.

26) The Statesman: 24th June to 10th August, 1985.

27) Offshore News, Vol 2, No. 10, 1982.

28) Science Today, November 1982.

29) Science Age, August 1985.

30) R B Clark, Marine Pollution, Clarendon Press, Oxford 1986.

31) R Johnston (Editor), Marine Pollution, Academic Press, 1976.

32) J Wardley-Smith (Editor), The Control of Oil Pollution, Graham and Trotman, London 1983.

33) Popular Mechanics, January 1986.

34) Surveyor, November 1985.

35) Growing up with Science, H C Stultman Inc. 1984.

36) J B Sweeney, A Pictorial History of Oceonographic Submersibles, Robert Hale and Company, 1970.

37) M J de Wit, Minerals and Mining in Antartica Clarendon Press Oxford 1985.

38) F E Vicuna (Editor). Antarctic Resources Policy: Scientific, Legal and Political Cambridge University Press, 1983.

39)R D Ballard, "A long last look at Titanic," National Geographic, V 170, No 6, December 1986. [Also National Geographic, December 1985].

[illegible]

[illegible] November 1983.

[illegible] August 1983.

[illegible] Press, Oxford 1986.

[illegible] Press, 1985.

[illegible] The [illegible] of [illegible] 1985.

[illegible] January 1986.

[illegible] November 1985.

[illegible]

[illegible] 1980.

[illegible] 1984.

[illegible] Press, 1985.

[illegible]

[illegible]

সমুদ্র ঃ শংকা ও আশংকা . . . . . .

সমুদ্র মানুষকে বার বার আকর্ষণ করে। সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে মানুষ যেমন ভেসে বেড়ায় সাগরের বুকে তেমনি সমুদ্রের অতলান্তে ডুব দিয়ে থাকে বিভিন্ন অনুসন্ধানিরা। সমুদ্র এখনো আমাদের কাছে নানানভাবে অপরিচিত রয়ে গিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমুদ্রের দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে খুব কমই মানুষকে আড়াল করতে পেরেছে। সমুদ্রকে ঘিরে যে সব আশংকাগুলো রয়েছে, সেই বিষয়গুলোই এই বইতে আলোচিত হয়েছে। বিষয়গুলোকে লেখক যেমন দেখেছেন ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তেমনি এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সমুদ্র বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারায়।

লেখক ডঃ মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়, আই. আই. টি-র নৌপ্রযুক্তি বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। এঁর বিভিন্ন গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। বর্তমান বইটিতে লেখক তার অভিজ্ঞতার নিরিখে বিভিন্ন সামুদ্রিক শংকা ও আশংকার বিশ্লেষণ করেছেন।

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা

বেস্টবুক্স্

১এ কলেজ রো, কলিকাতা ৭০০ ০০৯

ISBN-81-85252-39-4